ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা।

[অর্থাৎ চৈতন্যের জীবন ও ধর্ম্ম]

পূর্ব্ব বিভাগ।

তৃতীয় সংস্করণ।

" যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥ "

[আদি পুরাণ।]

শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা কর্ত্তৃক
বিরচিত।

কলিকাতা,
২১০/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে
শ্রীভুবনমোহন ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮০৭। বৈশাখ।

অবতরণিকা।

পরম ভাগবত শ্রীমচ্চৈতন্যচন্দ্রের সুবিমল মুখকান্তি বিগত চারি শত বৎসরের মধ্যে এতাদৃশ মলিন ভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছে, যে তাঁহাকে যাঁহারা দিব্যচক্ষে সন্দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা হঠাৎ দেখিলে আর চিনিতে পারেন না। চৈতন্যদেব আমার স্বদেশস্থ প্রতিবাসী এবং হৃদয়-বন্ধু, তাঁহার বাল্য যৌবন এবং শেষ সকল অবস্থার সঙ্গী হইয়া যখন যাহা ঘটিয়াছে প্রায় সমস্তই আমি দেখিয়াছি। এক্ষণে আমার বয়স অনেক হইল, কোন্ দিন সংসার পরিত্যাগ করিয়া পরলোক যাত্রা করিতে হইবে তাহারই প্রতীক্ষায় রহিয়াছি, এ সময় প্রতিবাসী এবং পরমোপকারী সাধু বন্ধুর প্রতি যে কিছু কর্ত্তব্য তাহা করিয়া যাইতে চাই। কিন্তু ইহাত সামান্য ঘটনা বা সাধারণ মানবচরিত্র নহে যে ইচ্ছা করিলেই লিখিতে পারিব? গভীরাত্মা ভক্তগণ কখন কোন্ অভিপ্রায়ে কি কার্য্য করেন তাহা সামান্য বুদ্ধিতে কি হৃদয়ঙ্গম করা যায়? প্রকৃত বিশ্বাসী সাধুরা সেই অনন্ত গুণাকর জগদীশ্বরের মহিমার কণিকা মাত্র যাহা উপলব্ধি করিতে পারেন তাহার কিয়দংশ মাত্র ভাষা এবং বাহ্য ব্যবহার দ্বারা বাহিরে প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাহার অন্তর্গত যথার্থ তত্ত্ব গতানুগতিক শিষ্যপরম্পরায় নানাবিধ বিপরীত অর্থ এবং টীকার মধ্যে ক্রমে অদৃশ্য হইয়া পড়ে; সুতরাং এক জনের জীবনগত প্রত্যক্ষ জ্ঞানলব্ধ পরমার্থতত্ত্ব অপরের বুদ্ধিগত পরোক্ষ জ্ঞানে কদাপি অনুভূত হইবার নহে। সাধু মহাজনেরা যে অবস্থায় যে ভাবে যে সত্যসুধা আস্বাদন করিয়াছেন, ঠিক তদবস্থাপন্ন তদ্ভাববিশিষ্ট না হইলে অন্যে তাহা কি রূপে উপলব্ধি করিবে? কিন্তু ভক্তচরিত্রের উপরিভাগে যে সকল সামান্য ঘটনা স্বভাবতঃ উদ্ভাসিত হয়, রসিক সাধুগণ তাহার অভ্যন্তরেই তাঁহাদের হৃদ্গত স্বর্গীয় প্রতিভা অবলোকন করিয়া থাকেন; এই ভরসায় চৈতন্যচরিতাখ্যান রচিত হইল। এই ভক্তশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের জীবনক্ষেত্রে যে সকল আশ্চর্য্য অলৌকিক ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে তাহা যেমন একদিকে কুতার্কিক বাহ্যদর্শী জ্ঞানীদিগের প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানের দুরধিগম্য, তেমনি অপরদিকে বিজ্ঞানবিমুখ [illegible] বিশ্বাসীদিগের

অবিশুদ্ধ ভক্তি বিশ্বাস এবং ভাবুকতারও অগোচর ; কেবল তাহা নহে, স্বর্গীয় ভক্তি, এবং অধ্যাত্ম প্রেমরাজ্যের এমন সকল নিগূঢ় ঘটনা এবং অদ্ভুত ক্রিয়া আছে যাহা সাধারণ ধার্ম্মিকদিগেরও জ্ঞান বুদ্ধির অতীত। যিনি এই ত্রিবিধ সম্প্রদায়স্থ মানবস্বভাবের ঊর্দ্ধদেশে ভক্তিলীলার অত্যুচ্চ বিধানোপত্যকায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন তিনিই কেবল সে সমুদায়ের প্রকৃত মর্ম্ম অবধারণে সক্ষম। অদৃশ্য চিচ্ছক্তি এই ভক্তির প্রভাব যখন একটি আত্মা হইতে অপরাত্মাতে সংক্রামিত হয় তখন বিজ্ঞান বুদ্ধির অদর্শনীয় অনেক নূতন অলৌকিক কার্য্যও সংঘটিত হইয়া থাকে। সাধারণ লোকচক্ষুর অগোচরে বিশ্বাসী ভক্তগণের সম্মুখে বিজ্ঞানঘন ঈশ্বর এমন এক চিন্ময় ব্রহ্মাণ্ডের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেন যাহা কল্পনাতেও কখন আমরা অনুভব করিতে পারি না। বিশ্বাসী সেবক ভিন্ন প্রভুর গুপ্ত ভাণ্ডারের অমূল্য রত্নরাজি অন্য কেহ সম্ভোগ বা দর্শনে অধিকারী নহে। ঈদৃশ দৈবশক্তিশালী চৈতন্যের জীবন এবং ক্রিয়ার প্রকৃত ছবি চিত্রিত করিতে আমরা কত দূর সক্ষম হইলাম তাহা জানি না। সাধু ইচ্ছার প্রেরণায় এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা গেল। ভক্তিপথাবলম্বী হৃদয়বান্ সাধুসজ্জনগণ স্বীয় স্বীয় প্রজ্ঞা এবং প্রেমপ্রতিভানুসারে প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিয়া লইবেন। চৈতন্য চন্দ্রের প্রবল আকর্ষণে যে ভক্তিসমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া এই বঙ্গভূমিকে প্লাবিত করিয়াছিল এবং যাহা মন্থন করিয়া তিনি এবং তাঁহার শিষ্যগণ বহুল ধনরত্ন আচণ্ডালে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন, আনুসঙ্গিক তদ্বিষয়ক বিবরণও কিঞ্চিৎ ইহাতে থাকিল। চৈতন্যজীবনের হরিভক্তি ব্যাকুলতা প্রেমোন্মত্ততা বৈরাগ্য, এবং অন্যান্য ভক্তগণের ধর্ম্মভাব আলোচনা করিলে পাষাণ হৃদয় বিগলিত হয়। "চৈতন্যভাগবত" "চৈতন্যচরিতামৃত," "চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা ভক্ত বৈষ্ণবগণের সাহায্য অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ লিখিত হইল, এ নিমিত্ত আমরা ঐ সকল মহাত্মাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। এই পুস্তকের মধ্যে যে কেবল মানবজীবনের তরল কমনীয় বিভাগের বিচিত্র বিকাশমাত্র দৃষ্টিগোচর হইবে তাহা নহে, পদ্মরাগ মণির ন্যায় ঘনীভূত প্রেমবিজ্ঞান, এবং ভক্তিরসরঞ্জিত উজ্জ্বল হীরক সদৃশ দিব্যজ্ঞানের কঠিন সত্য সকলও ইহাতে দেখিয়া চিন্তাশীল সারগ্রাহী বিজ্ঞজনেরা আনন্দানুভব করিবেন। ইহাকে সেই সচ্চিদানন্দ প্রেমময় ঈশ্বরের অপরূপ প্রেমলীলার এক খানি সুন্দর ছবি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

অবশ্য আমরা যে চক্ষে গৌরলীলা দর্শন করিতেছি সকলেই কিছু সেরূপ দেখিবেন না। অনেকে মনে করিতে পারেন, বিজ্ঞানালোকিত সভ্যতার সময় বৈষ্ণব বৈরাগীর কথা আর কেন? ইহার ভিতর এমন কি জ্ঞাতব্য বিষয় আছে যাহার জন্য অমূল্য সময় ব্যয় করা যাইতে পারে? বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এক্ষণে যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে তাহাতে সহসা এরূপ প্রশ্ন মনে উদয় হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু যাঁহারা হরিভক্তিকে ভাবান্ধতা, সাধু সম্মাননাকে নীচতা এবং অজ্ঞতা বলিয়া মনে করেন,—মহাত্মা চৈতন্যদেব এবং তদীয় জ্ঞানবান্ উন্নত পদারূঢ় শিষ্যগণ কিরূপ উচ্চ প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহাদের চরিত্র কেমন বিশুদ্ধ এবং স্বভাব কেমন কোমল ছিল, এই সকল দেশকে এক সময় তাঁহারা হরিভক্তিতে কেমন আন্দোলিত করিয়া গিয়াছেন,—তৎসমুদায় যদি তাঁহারা অবগত থাকিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় এ সম্বন্ধে কোন রূপ কুসংস্কার তাঁহাদের মনে স্থান পাইত না। আশা করি, ভগবানের কৃপায় কোন না কোন সময়ে প্রত্যেকেই ইহার আস্বাদন পাইয়া কৃতার্থ হইবেন।

পৃথিবীতে সাধু মহাপুরুষেরাই আদর্শ মনুষ্য। মানবজীবনের যদি কিছু গৌরব থাকে, তবে তাহা ঐ সকল ব্যক্তিদিগের দ্বারাই সপ্রমাণিত হইয়াছে। বহু সহস্র জ্ঞানী সভ্য ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিকে তুলাদণ্ডের বামদিকে রাখিয়া দক্ষিণদিকে যদি এক জন পবিত্রাত্মা মহাপুরুষকে স্থাপন করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই, দক্ষিণের কাঁটা ঝুলিয়া পড়ে। রক্ত মাংস বিদ্যা বুদ্ধি মান ঐশ্বর্য্যের ভারে নহে, কিন্তু হরিভক্তির গুরুত্বে ঝুলিয়া পড়ে। এক এক জন মহাপুরুষের পবিত্র নিঃশ্বাসে এই পৃথিবীতে শত শত ধর্ম্মবীর উৎপন্ন হইয়া জনসমাজকে নীতি ও ধর্ম্মের সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিয়া গিয়াছেন। বিপুল পরাক্রমশালী ভূপতি ও সংগ্রামকুশল বীর পুরুষেরা বহু সহস্র সৈন্য এবং শাণিত যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা কত দেশ মহাদেশ জয় করিতে পারেন, তথাপি কাহারো হৃদয়কে তাঁহারা বশীভূত করিতে সক্ষম হন না। কিন্তু ধর্ম্মাত্মা মহাপুরুষেরা কেবল ক্ষমা প্রেম দীনতার অস্ত্রে কত কত রাজ্য এবং দেশকে পদানত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের ধন জন নাই, যুদ্ধাস্ত্র বুদ্ধিকৌশল নাই, অতি দুঃখীর ন্যায় পৃথিবীতে আসিয়া, বহুল নির্য্যাতন অপমান সহ্য করিয়া তাঁহারা চলিয়া যান; কিন্তু পরিণামে তাঁহাদের মরণে লোকের জীবন, তাঁহাদের দুঃখ শোক অপমানে লোকের প্রচুর সুখ শান্তি মঙ্গল প্রসূত হয়।

ঈশ্বরের কার্য্য যেমন আড়ম্বরশূন্য, অথচ তাহা অতি মহান্ ফল উৎপাদন করে, সাধু মহাপুরুষের কার্য্যও তেমনি প্রথমে প্রচ্ছন্ন, পরে দ্বাদশ সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া জগতে আলোক বিতরণ করে। যখন আমাদের ন্যায় মায়াবদ্ধ জীবগণ পাপপ্রবৃত্তিদিগকে দমন করিতে অক্ষম হইয়া ভগ্ন-হৃদয়ে অনুশোচনা করে, এক বিন্দু শান্তিরসের জন্য লালায়িত হইয়া বেড়ায়, পরীক্ষা প্রলোভন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়িয়া হতাশ হয়, তখন দেখি যে হরিভক্ত সাধু অটল পর্ব্বতের ন্যায় শান্তভাবে সকল বহন করিতেছেন, বিশ্বাস ভক্তির বলে পৃথিবীতে বসিয়া সহস্র বিঘ্নের মধ্যেও শান্তি ও স্বর্গভোগ করিতেছেন। শত শত বিজ্ঞ পণ্ডিত যে তত্ত্ব শিক্ষা দিতে পারেন না, এক জন দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান কিংবা সূত্রধরের তনয় তাহা সহজে দেখাইয়া দেয়। ভগবান্ কি পদার্থ তাহা ভক্তকে না দেখিলে কেহ বুঝিতে পারিত না। ভক্তেরা জীবের দুর্গতি ভগবান্‌কে বলেন, এবং ভগবানের ঐশ্বর্য্য মহিমা জীবের নিকট প্রকাশ করেন। লোকগুরু ধর্ম্মাচার্য্যগণ ভগবান্ কর্তৃক বিশেষরূপে প্রেরিত। আত্মাদরপরায়ণ শিক্ষিত ব্যক্তিরা জ্ঞান সভ্যতার যতই অভিমান করুন না কেন, ইহাঁরা ধর্ম্মাত্মা মহাপুরুষদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে পারেন না। পৃথিবীর উপার্জ্জিত বিদ্যা উপাধি ধন মানের কি এই দেবদত্ত প্রতিভার সঙ্গে তুলনা হয়? এখনকার কালে সাধারণতঃ শিক্ষিত দলের মধ্যে পাণ্ডিত্য এবং ধর্ম্মাভিমানের বড়ই প্রাদু-র্ভাব। এই জন্য তাঁহারা উন্নতাত্মা ভক্তজনকে ভক্তি করিতে চাহেন না। প্রভাবশালী কবি, প্রতিভান্বিত বিজ্ঞানী, মহা যশস্বী ধনী, রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত, সমরকুশল বীর, ইহাঁরা জনসমাজের শিরোভূষণ বলিয়া গৃহীত হই-বেন, কেবল হরিভক্ত সাধুজনের প্রতিই বীতরাগ প্রকাশ হইয়া থাকে। ইহার নিগূঢ় কারণও বহু দূরে নহে। সিদ্ধপুরুষ পবিত্রচরিত্র ভক্তগণ যাহা কিছু সৎ সে সমুদায় ঈশ্বরেতে আরোপ করেন। নিজেদের অসাধারণ মহত্ত্ব এবং শৌর্য্য বীর্য্য প্রতিভা সত্ত্বেও বিন্দুমাত্র আমিত্ব সেখানে স্থান পায় না। ঈশ্বর ভিন্ন সত্য সাধুতা মঙ্গল কার্য্যের কর্ত্তা কেহ নাই, এই তাঁহাদের বিশ্বাস। কিন্তু আধুনিক জ্ঞানাভিমানী সাধুবিদ্বেষী ব্যক্তিদিগের পক্ষে তাহা নিতান্ত অসহনীয়। আপনাদের বল বুদ্ধি ক্ষমতা সদনুষ্ঠান যাহা কিছু সমস্তই ইহাঁরা আপনাদের মহিমা প্রতিপাদক জ্ঞান করত "আমি কর্ত্তা" "আমি জ্ঞানী" ইত্যাকার অহং সূচক ভাব দ্বারা সর্ব্বদা পরিচালিত

হয়েন। যাহাতে আমিত্ব চরিতার্থ হয় না, নিজের অসার গরিমা লোকসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে না, সে সকল কার্য্যে ইহাঁদিগকে দেখিতে পাইবে না। প্রেরিত মহাপুরুষদিগকে গ্রাহ্য করিও না, কিন্তু আমাদিগকে সুশিক্ষিত মার্জ্জিতবুদ্ধি কর্ত্তব্যপরায়ণ দেশহিতৈষী বলিয়া জয়পত্র লিখিয়া দাও, আমাদের মত ও কার্য্যের অনুগামী হও, এই ইহাঁদের আন্তরিক অভিলাষ। উভয়ের মধ্যে কত প্রভেদ তাহা এখন সকলে বুঝিয়া লউন। কোন সৎকার্য্যকে ঈশ্বরাভিপ্রেত বলিলে ঐ সকল লোকের শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠিবে, ভগবানের প্রীতিকামনায় তাবৎ কার্য্য সাধন করা উচিত ইহা বলিলে ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে, কিন্তু বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত, বহুলোকসম্মত যে কার্য্য তাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ হইলেও শিরোধার্য্য। ইহাঁরা ঈশ্বরের বিচার-সিংহাসনে উপবেশন করত আত্মগৌরব চরিতার্থ করেন, অথচ মুখে তাঁহাকে সর্ব্বোপরি দেবতা বলিয়া জগতে ঘোষণা করিয়া থাকেন। সাধু সিদ্ধপুরুষের বাক্য সহস্র অজ্ঞান অল্পবিশ্বাসীর বিচারে মিথ্যা প্রতিপন্ন হইবে, হায়! কি ঘোর কলি! জড় জগতে জড়প্রিয় মানবের জড়যন্ত্রপ্রসূত কার্য্যই এখন অভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। রক্ত মাংস অস্থি এবং বিষয়বুদ্ধির দ্বারা সাধুর দিব্যজ্ঞানালোক আচ্ছাদিত হয়, কি দুর্দ্দশা!

এ প্রকার পুস্তক যে জড়বাদী ভক্তিবিদ্বেষী জ্ঞানীদিগের পক্ষে রুচিকর হইবে না তাহা এক প্রকার নিশ্চয়; কেন না, সভ্যসমাজে শিক্ষিত দলের ভিতরে জীবন্ত জ্ঞান ও কবিত্বরস নাই, কেবল পুঁথিগত মৃত জ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্রই সর্ব্বস্ব। তবে সভ্যতার নয়নমুগ্ধকর নীতি ও বিজ্ঞানসম্বন্ধে ইহাঁরা পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত বটেন। কিন্তু আধুনিক জ্ঞান সভ্যতার যিনি যত কেন প্রশংসা করুন না, সেকেলে লোকদিগকে যতই কেন নির্ব্বোধ অসভ্য বলুন না, যথার্থ কথা বলিতে কি, পূর্ব্বকালের লোকদিগের মত ইহাঁদের ঈশ্বরভক্তি দয়া প্রেম সরলতা এবং দৈববিদ্যা নাই। জ্ঞানী যুবক, তুমি হয়ত বলিবে, জ্ঞানের অল্পতা বশতঃ তাহাদের বিশ্বাস ভক্তি অধিক ছিল, ইহা বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত না হওয়া, কল্পনাশক্তি অধিক থাকা এবং বস্তুতত্ত্ব না জানার ফল; বুদ্ধি কিঞ্চিৎ পরিমার্জ্জিত হইলে ভক্তি বিশ্বাস ঈশ্বর পরকাল ধর্ম্মসাধনে এ সমুদায়ের আর কোন প্রয়োজন থাকিবে না, এক সভ্যতা প্রভাবেই সকল অভাব পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। কিন্তু

ইহা নিতান্ত ভুল। স্বাভাবিক বিশ্বাস ভক্তি বিজ্ঞানমন্দিরের সভ্যতার চরম শিখরের উপরে চির দিন বিরাজ করিবে। পূর্ব্বকালের সহজজ্ঞানসম্পন্ন হরিভক্তদিগের স্বাবলম্বিত বুদ্ধি ক্ষমতা বড় কমও ছিল না। দৈববলে দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহারা যাহা বলিয়া এবং করিয়া গিয়াছেন, আধুনিক কৃতবিদ্য-নামধারী যুবকদল শরীর পাত করিলেও তেমনটি পারিবেন না। এখন বিবিধ বিলাস সুখ সম্ভোগ করিয়া এবং উজ্জ্বল বিজ্ঞানালোক লাভ করিয়াও যে কেহ সুখী হইতে পারিতেছেন না তাহার কারণ এই যে,ইহাঁদের জীবনে হরিভক্তি এবং কবিত্বরস নাই। কেবল অঙ্ক কষিয়া সাধারণ নিয়ম দ্বারা চালিত হওয়া, ঈশ্বরের গূঢ় এবং উচ্চ নিয়মে বিশ্বাস না করাই ইহার কারণ। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যাঁহারা ধর্ম্মের অনেক উচ্চ কথা বলিয়া নিজেদের গৌরব ঘোষণা করেন, তাঁহাদের মধ্যেও শান্তিরসের বড় অভাব। অনেকে আবার নূতনবিধ কুসংস্কারে পতিত হইয়া ক্রমাগত অন্ধকারে ভ্রমণ করিতেছেন। ধর্ম্মের মধ্যে যাহা সার হরিভক্তি তাহা অধিকাংশের নিকট কল্পনা বলিয়া প্রতীত হয়। একে বিশ্বাস দুর্ব্বল, তাহাতে ভক্তি নাই, তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে অনভিজ্ঞতাও যথেষ্ট, অথচ তাহার সঙ্গে সাধুতার অভিমান আছে, সুতরাং তাঁহাদের রোগ বড় কঠিন।

এক্ষণে জ্ঞান ধর্ম্ম নীতি সভ্যতার উন্নতিসম্বন্ধে যেরূপ সুচারু বিধি স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে বোধ হয় যেন সকল বস্তু কলের দ্বারা প্রস্তুত হইতেছে। বাস্তবিকও তাহাই বটে। জ্ঞান সভ্যতার প্রকাণ্ড কল ঘুরিতেছে, মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিয়া যাই তাহার মধ্যে একবার পড়িল অমনি মানুষ হইয়া গেল, কোন বিষয়েরই আর অভাব নাই। লোকে এখন আর কোন কার্য্য দৈহিক পরিশ্রম দ্বারা করিতে ইচ্ছা করে না। যদি এমন কোন কল থাকিত, তবে জীবনের সমুদায় দায়িত্ব ভাবনা চিন্তা তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া তাহারা নিশ্চিন্ত হইত। এমন লোকও আছেন যাঁহারা সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতার পর্য্যন্ত ভুল ধরিয়া থাকেন। এক্ষণে লোকের বুদ্ধির উপর এত নির্ভর হইয়াছে যে, ঈশ্বরের কর্তৃত্ব অনেকে স্বীকার করে না; যাহারা করে তাহারা বলে তিনি থাকেন থাকুন, আমাদের সঙ্গে তাঁহার কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই। আদিমকালে যেমন প্রত্যেক ভৌতিক কার্য্য দৈবকার্য্য বলিয়া প্রতীত হইত, এখন তেমনি সমুদায় ব্যাপার বল বুদ্ধির অধীন এইরূপ অনেকে মনে করেন। তাঁহারা ঈশ্বরকে পেনসেন্ দিয়া

নিষ্ক্রিয় করিয়া বিদায় করিতে চাহেন, কিন্তু পারেন না। বিপদ ও মৃত্যু-কালে, স্ত্রীবিয়োগ বা পুত্রশোকের সময় তাঁহাদিগকে হয়ত আবার পঞ্চানন মঙ্গলচণ্ডী ষষ্ঠী মাকালের পূজা করিতে হয়। জ্ঞান সভ্যতার চরম উন্নতি হইলে অন্যান্য বিষয়ে কি হয় বলা যায় না, কিন্তু ঈশ্বরের নিজের কার্য্যও যে কল দ্বারা সম্পন্ন হইবে, এ কথাত কিছুতেই বিশ্বাস হয় না।

দেবত্বপরিভ্রষ্ট হইয়া যে মনুষ্যগণ এইরূপে জড়যন্ত্রবৎ থাকিতে চায় ইহা তাহার পক্ষে ঘোর বিড়ম্বনা ভিন্ন আর কি বলা যাইবে? যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান এবং কবিত্বের মাধুর্য্যরস আস্বাদনের অভাবেই এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। অবোধ লোকেরা আপনার স্বভাবকে বিকৃত এবং বিনষ্ট করিয়া উন্নত হইতে চাহে। কিন্তু সে বিধাতার সৃজিত জীব, তাহার ভিতরে ভগবানের শক্তি অবস্থিতি করিতেছে ইহা সে জানে না; যখন জানিতে পারিবে তখন নিশ্চয় লজ্জিত হইবে।

আমরা যে বিষয়ের এক্ষণে অবতারণা করিলাম ইহা মানবস্বভাবের প্রাকৃতিক মহত্ত্বকে পরিপোষণ করিবে, এবং অসার জ্ঞানগর্ব্ব, বুদ্ধির অভিমানের অপদার্থতা বুঝাইয়া দিবে। ভক্তি এবং চৈতন্য যদিও এক্ষণে বৈষ্ণবদিগের আদৃত বিষয় বলিয়া সামান্যতঃ উপেক্ষিত হয়, কিন্তু তত্ত্বানুসন্ধায়ী হরিভক্ত জনের নিকট ইহার আদর চিরকাল আছে এবং থাকিবে। যে সকল স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তি মাতৃভূমির গৌরব ঘোষণা করিয়া থাকেন, মহাত্মা চৈতন্যের জীবন এবং ধর্ম্মসম্প্রদায় একটি অনুসন্ধেয় এবং সুখকর পাঠ্য বলিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন। শ্রীগৌরাঙ্গের নামের গুণে এই বঙ্গদেশ ধন্য হইয়াছে। এই মহাত্মার জীবন যাঁহারা ভক্তির সহিত অধ্যয়ন করিবেন তাঁহাদের প্রাণ বিগলিত এবং হৃদয় পরিতৃপ্ত হইবে। এ প্রকার প্রেমরসময় জীবন বর্ত্তমান কালের শান্তিরসহীন মায়ামুগ্ধ জীবগণের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন জানিয়া এবং মহাত্মা চৈতন্যের নাম সভ্যসমাজে চিরকাল উজ্জ্বল থাকিবে, ভক্তিপ্রার্থী দীনাত্মাদিগের নিকট তাঁহার জীবন আদর্শরূপে গৃহীত হইবে এই আশা করিয়া, আমরা এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলাম। দয়াময় সিদ্ধিদাতা হরি আমাদের সহায় হউন!

এই "ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা" পাঠে কোন তাপিতহৃদয় ভক্তিপিপাসু নরনারীর অন্তরে যদি বিন্দুমাত্র প্রেমরসের সঞ্চার হয় তবে তাঁহারা যেন তাহার কিঞ্চিৎ অংশ গ্রন্থকারকে দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন।

সূচীপত্র।

ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা।

নবদ্বীপের প্রাচীনাবস্থা।

যে সময় চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন, তখন নবদ্বীপ এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান ও জনসমূহের জ্ঞানধর্ম্মনীতিসম্বন্ধে যেরূপ অবস্থা ছিল তাহা আলোচনা করিলে অনেক শিক্ষা লাভ হয়; এবং বর্ত্তমান কালের সঙ্গে তাহার তুলনা করিয়া দেখিলে অনেক বিষয়ে ঘোর পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। এই নবদ্বীপ হিন্দু রাজত্বের শেষ অভিনয়ের রঙ্গভূমি। ইংরাজি ১২০৩ সালে মুসলমান সেনাপতি বক্তিয়ার খিলিজি যখন কতিপয় অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যহারে নবদ্বীপ নগরে প্রবেশ করিলেন, তখন হইতেই হিন্দু রাজত্বের সৌভাগ্যসূর্য্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইল। ভীরু স্বভাব লাক্ষ্মণেয় শূর সেন যবনসেনাপতির সমাগমবার্ত্তা যাই শুনিলেন, অমনি পশ্চাদ্দ্বার দিয়া সপরিবারে নৌকারোহণপূর্ব্বক জগন্নাথক্ষেত্রে পলায়ন করিলেন, মুসলমানেরা দেশ অধিকার করিয়া লইল। এই সেন-বংশীয় রাজাদিগের ভগ্নাবশেষ চিহ্ন কিছু কিছু এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে যে স্থান নবদ্বীপ বলিয়া খ্যাত, ইহার উত্তর পূর্ব্ব অর্দ্ধক্রোশ দূরে রাজা বল্লাল সেন একটী বাটী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় এক বৃহৎ দীঘী খনন করেন। ইহা বল্লালদীঘী নামে প্রসিদ্ধ। দীঘী ও বাটীর চিহ্ন অদ্যাপি কিছু কিছু বর্ত্তমান আছে। দীঘীর উত্তর দিকে বল্লালেরচিবি নামে একটি উচ্চ স্থান দৃষ্টিগোচর হয়। এখানে মৃত্তিকাগর্ভে অনেকানেক প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ চিহ্ন সকল বর্ত্তমান ছিল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষেরা এই স্থান হইতে অনেক পাথর এবং পাথরের থাম লইয়া গিয়াছিলেন এরূপ প্রবাদ আছে। ঐ উচ্চ ভূমি অগ্রে পুরাতন নবদ্বীপ

ছিল। সে নবদ্বীপ এখন আর নাই, গঙ্গার গর্ভে প্রবেশ করিয়াছে পূর্ব্বে এই নগরের দক্ষিণে পশ্চিমে গঙ্গা ও পূর্ব্বদিকে খড়িয়া নদী বহমান ছিল। এই দুই নদী গোয়ালপাড়া নামক গ্রামের নিকট গিয়া মিলিত হয়। কিছু দিনান্তে ভাগীরথীস্রোত পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া নবদ্বীপের উত্তরাংশ ভগ্ন করত বল্লালদীঘীর দক্ষিণে খড়িয়া নদীর মধ্যে গিয়া পড়ে। গঙ্গার স্রোতে নগরের উত্তর দিক্ ভগ্ন হওয়াতে অধিবাসিগণ ক্রমে দক্ষিণ দিকে আসিয়া বাস করেন, এই স্থান এখন নবদ্বীপ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে কিছু দিন পর্য্যন্ত ইহা একটি সামান্য পল্লীর ন্যায় ছিল। পরে অনুমান চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এক জন যোগী এখানে আসিয়া এক দেবীর ঘটস্থাপন করেন। তিনি এক জন সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দেবীর মাহাত্ম্যও চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়ে। এই উপলক্ষে এবং সংস্কৃত অধ্যয়ন ও গঙ্গাস্নান করিবার মানসে নানা স্থান হইতে লোক সকল আসিয়া এই স্থানকে ক্রমে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছে। এক্ষণে নবদ্বীপের উত্তর পূর্ব্বদিকে নির্ম্মলসলিলা স্রোতস্বতী ভাগীরথী প্রবাহিতা। কিন্তু নবদ্বীপকে একটি গণ্ডগ্রাম ভিন্ন এখন আর কিছু বলা যাইতে পারে না।

বহু পূর্ব্বে হিন্দুরাজত্বের সময় হইতে এক্ষণ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের মধ্যে এই নবদ্বীপ বিদ্যাচর্চ্চাসম্বন্ধে একটি প্রধান স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। তৎকালে ঐ অঞ্চলের লোকদিগের আচার ব্যবহার রীতি নীতি যেরূপ ছিল, তাহারা যে ভাবে দিন কর্ত্তন করিত, তৎসম্বন্ধে কিছু লিখিলে বোধ হয় পাঠক মহাশয়দের বিরক্তিকর হইবে না।

মুসলমান নবাবদিগের আমলে এ দেশের উন্নতির দ্বার প্রায় সমস্তই বন্ধ ছিল। যেমন তাঁহাদের শাসনপ্রণালী, আচার বিচার, তেমনি তাহাদের চরিত্র; তখন কাহার শ্রাদ্ধ কে করিত তাহার ঠিক ছিল না। তবে মোটা ভাত মোটা কাপড়ের জন্য কেহ ভাবিত না, প্রচুর পরিমাণে শস্যাদি দেশে সঞ্চিত থাকিত। কিন্তু রাজা যদি অলস বিলাসপরায়ণ অসভ্য জ্ঞানহীন অস্থিরমতি হয়, তবে আর রাজ্যের মঙ্গল কিরূপে হইতে পারে? নবাবি আমলে প্রজারা এক প্রকার অতি অসভ্য বর্ব্বরের ন্যায় কাল যাপন

করিত। সে সময় গৌড় নগর বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল। কয়েক জন মিশর দেশীয় কাফ্রি দাস তখন প্রবল হইয়া রাজসিংহাসন অধিকার করে। গৌরাঙ্গের জন্মের অব্যবহিত পূর্ব্বে মল্লিক আণ্ডেল্ নামে এক কাফ্রি সেনাপতি তদীয় মনিব কোন এক ক্লীব নরপতিকে হত্যা করিয়া সে আপনি রাজা হয়। এই কাফ্রি মুসলমানেরা প্রজাবর্গের উপর ভয়ানক অত্যাচার করিত।

বঙ্গীয়সমাজ অতি আধুনিক সমাজ, পূর্ব্বে এ দেশে সাঁওতাল ধাঙ্গড় কোল্ প্রভৃতিরই বসবাস ছিল। আর্য্যগণ কিরূপে এখানে আসিয়া আধিপত্য বিস্তার করিলেন, বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি কি প্রণালীতে হইল, তাহা ভাবিয়া ঠিক করা যায় না। বোধ হয়, রাজা আদিস্থরের কিছু পূর্ব্ব সময় হইতে দেশীয় আদিম অসভ্য এবং আর্য্যবংশের সম্মিলনে বাঙ্গালী জাতির সৃষ্টি হইয়া থাকিবে এবং তাহারাই হিন্দুরাজত্বকালে ক্রমে ভদ্র বঙ্গীয়-সমাজ সংগঠন করিয়াছে। মুসলমানদিগের উৎপীড়নে সামাজিক উন্নতির স্রোত কিছু দিনের জন্য বন্ধ হইয়া যায়। বাঙ্গালীর ভিতরে যে এত গুণ-গ্রাম ছিল তাহা পূর্ব্বে কেহ জানিত না। এখন ইহারা বিদ্যা বুদ্ধিতে বিলক্ষণ উন্নত হইয়া উঠিয়াছে, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে। গায়ে আর একটু বেশী বল এবং মনে কিঞ্চিৎ সাহস ভরসা থাকিলে এমন কি ইহারা ইংরাজদিগের সঙ্গে লড়াই করিতেও পারিত। ফলে বঙ্গসমাজে এখন এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। সে কালের সঙ্গে এখন আর কিছুরই প্রায় ঐক্য দেখা যায় না।

ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি ভদ্রলোকদিগের সামাজিক অবস্থা অবশ্য কতক পরিমাণে তখন ভাল ছিল। কায়স্থেরা পার্সি বিদ্যা শিখিয়া নবাব-সংসারে কাজ কর্ম্ম করিতেন। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারা টোলধারী তাঁহাদের মধ্যেই শাস্ত্রচর্চ্চা অধিক ছিল, তদ্ব্যতীত গুরু পুরোহিত শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরাও নামমাত্র কিছু কিছু সংস্কৃত শিক্ষা করিতেন; অপর ব্রাহ্মণগণ পাঁচ রকম উঞ্ছ বৃত্তিতে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। বাঙ্গালা ভাষার তখন জন্ম হয় নাই, প্রাকৃত গ্রাম্য ভাষা পার্সি এবং উর্দ্দুর সহিত মিলিত হইয়া এক প্রকার প্রচলিত ভাষা প্রস্তুত হয়, তাহা দ্বারা কার্য্য চলিত।

অধিকাংশ ভদ্রাভদ্র লোকই মূর্খ ছিল। বিদ্যা বুদ্ধি শাস্ত্র ধর্ম্ম এ সমস্ত অধ্যাপক ও ব্রাহ্মণেরা আপনাদের নিজস্ব সম্পত্তি করিয়া রাখিয়াছিলেন। তখনকার স্ত্রী পুরুষদিগের শরীর দীর্ঘাকার, বলিষ্ঠ এবং মন অত্যন্ত শাদা সিদে ছিল। পুরুষেরা খুব খাইতে পারিত, নিমন্ত্রণে গিয়া কেহ কেহ হয়ত এক বগুনা ডালই খাইয়া ফেলিত। আহারের বিষয়ে অনেক অদ্ভুত গল্প প্রচলিত আছে, সে সব কথা থাকুক। দাড়ি গোঁফ রাখার প্রথা ছিল না, কিন্তু সকলের মাথায় টিকি শোভা পাইত। ঘাড় কামান, থরকাটা, জুল্পি এবং দীর্ঘ কেশ তাহারা ভালবাসিত। জুতা পায় দেওয়ার রীতি প্রায় ছিল না, অনেকেই খড়ম ব্যবহার করিতেন। আহারের মধ্যে মোটা চাউল, পরিধান দেশীয় সূতার স্থূল বসন। চাকুরে লোকেরা অপেক্ষাকৃত সৌখীন ছিলেন। প্রাচীনেরা এখনকার মত পাড়ওয়ালা ফিন্‌ফিনে কাপড় পরা, বার্ণিশযুক্ত বুট পায়, গোঁফে কলপ মাখান সুখপ্রিয় বাবু ছিলেন না, তাঁহারা ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন; পাড়া প্রতিবাসীর প্রতি যথেষ্ট স্নেহ মমতা করিতেন, আত্মীয় কুটুম্ব ভাই বন্ধু সকলকে লইয়া এক পরিবারে থাকিতেন, ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতেন। বাশূলী ও বিষহরির পূজা, মঙ্গলচণ্ডীর গান, ঢাকের বাদ্য, ভেড়ার টুঁ, মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি আমোদের বিষয় ছিল। ষণ্ডাগোচের ভদ্রলোকেরা খুব পাঁঠা মহিষ ভেড়া বলিদান করিতে পারিত। স্ত্রীলোকেরা মোটা মোটা রূপার গহনা এবং নিজ হাতে কাটা সূতার কাপড় পরিতেন। সমস্ত দিন ভাত রাঁধা, ধান ভানা, গোবরনেদি দেওয়া, পৈতা তৈয়ার করা, শিকে বুনান, এই তাঁহাদের কার্য্য ছিল। পুরুষদের শাসনে স্ত্রীলোকেরা কাঁপিত, ঘোমটা একটু কম কিংবা কথা একটু উচ্চ হইলে তাহার নিন্দা বাহির হইত। কিন্তু স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই চরিত্র সাধারণতঃ বিনম্র ধর্ম্মভীত ছিল। তখন সুখ বিলাসের প্রতি লোকের এত দৃষ্টি পড়ে নাই।

ধর্ম্মসম্বন্ধে এখনও যেমন তখনও প্রায় তেমনি, ভূতপ্রেত দৈত্য দানব বিষহরি মঙ্গলচণ্ডী ঘেঁটু ষষ্ঠী প্রভৃতি গ্রাম্যদেবতার উপর ভয়মূলক এবং সুবিধাপ্রসূ বিশ্বাসেরই অধিক প্রাদুর্ভাব দেখা যাইত। প্রভেদ এই, এখন লোকে বিশ্বাসের শিথিলতার সঙ্গে অনুষ্ঠানের দৃঢ়তা অনেক ত্যাগ করিয়াছে, তখন সেরূপ ছিল না; স্বার্থের অনুরোধে, সমাজের এবং

বসন্ত ওলাউঠার ভয়ে ধর্ম্মভাব সকলেই প্রকাশ করিতেন। এখন যেমন অবিশ্বাস সন্দেহ নাস্তিকতার প্রাদুর্ভাব দৃষ্টিগোচর হয় তখন এরূপ ছিল না। ভয় বা স্বার্থমূলক ধর্ম্মবিশ্বাস হইলেও সে কালের নরনারীগণ দেবতার দৈবশক্তি ক্ষমতার উপর নিঃসন্দেহ বিশ্বাস স্থাপন করিতেন। ব্রাহ্মণদের ভয়ানক প্রতাপ ছিল, তাহাতেই সাধারণ লোকদিগকে ধর্ম্মকার্য্য সাধনে বাধ্য করিত। গুরু পুরোহিতের সঙ্গে কোন কথার তর্ক বিচার চলিত না, তাঁহারাই এক প্রকার হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ছিলেন। কায়স্থ নবশাখ প্রভৃতি জাতিকে ব্রাহ্মণেরা অনায়াসে বাপান্ত করিতে পারিতেন, তাহাতে কাহারো দ্বিরুক্তি করিবার সাহস হইত না। তখন শূদ্রদিগের পক্ষে মহা সঙ্কটের কাল ছিল, তাঁহারা ব্রাহ্মণের সঙ্গে একত্র বসিতেও পাই-তেন না।

ধর্ম্মের নিয়ম অনেকে পালন করিতেন, কিন্তু কেবল অক্ষরে, ভাব রক্ষা করিতে পারিতেন না। দুই পাঁচ জন অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক জ্ঞানী ব্রাহ্মণ ব্যতীত সমুদায় স্ত্রীপুরুষ স্বার্থকামনায় এবং ভয়প্রযুক্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম করিত। ধর্ম্মের উদ্দেশ্য কি তাহা না জানিয়া তাহারা কেবল ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া সংসারবাসনা চরিতার্থ করিত। নিষ্পাপ হইয়া ভগবানের পদারবিন্দ লাভ করিব, সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিব, চিন্তা বাক্য কার্য্য পবিত্র হইবে, ইন্দ্রিয়গণ বশে থাকিবে, ইষ্ট দেবতার প্রতি প্রেম ভক্তি অনুরাগ বিকসিত হইবে, এ সকল মহৎ ভাব তখন ছিল না, এক্ষণেও সাধারণতঃ তাহা নাই। সন্তান সন্ততি আত্মীয় স্বজনের সঙ্কট পীড়া উপস্থিত হইলে সত্যনারায়ণের সিন্নী এবং মঙ্গলচণ্ডীর পূজা দেওয়া, সর্পভয়ে বিষহরির গান শুনা, ধন পরমায়ু বৃদ্ধি এবং সন্তানাদি লাভ, ভয় বিপদ হইতে উদ্ধার ইত্যাদি নিকৃষ্ট কামনা চরিতার্থের জন্য দেবতাবিশেষকে মানস করিয়া পূজা ভোগ বলিদান দেওয়া হইত। ইহা ব্যতীত অন্য অভাব-বোধ ছিল না, সুতরাং ঠাকুরের অন্য কোন গুণ কেহ দেখিতে পাইত না। গুরু পুরোহিতেরা এই সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানকে সংস্কৃত বাক্য দ্বারা সপ্রমাণ করত নিজেদের সংসারযাত্রানির্ব্বাহের পথ পরিষ্কার রাখিতেন। যজমান সাংসারিক কুশল ও পারিবারিক শান্তির জন্য ধর্ম্মকর্ম্মে অনুরাগী, ধর্ম্মযাজক-

গণও আপনাদের সুবিধার জন্য তাহাতে উৎসাহী, এইরূপে উভয়ে উভয়কে ধর্ম্মের নামে বিষম প্রলোভনে ফেলিয়া মায়াজালে জড়িত করিতেন। আবার উচ্চশ্রেণীর অধ্যাপক পণ্ডিত শাস্ত্রিগণ বিশেষরূপে শাস্ত্রবচন প্রমাণ দ্বারা বিস্তৃত কর্ম্মকাণ্ডের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করত প্রচলিত আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করিয়া রাখিতেন। এই ত্রিবিধ শ্রেণীর লোক পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিয়া কপট ধর্ম্মক্রিয়াসকল পালন করিত। অধিকাংশ ভদ্র লোক শাক্ত ছিল, অল্প দুই পাঁচ জন বৈষ্ণব ছিলেন; কিন্তু সমাজের মধ্যে তাঁহাদের কোন প্রাধান্য দেখা যাইত না। জ্ঞানী হিন্দু দুই এক জন গীতা ভাগবত পাঠ করিতেন বটে, কিন্তু তাহার ভাবার্থ কেহ প্রায় বুঝিতে পারিতেন না।

এক দিকে শাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতগণ ধর্ম্ম ও ব্যবহারশাস্ত্র হস্তগত করিয়া বিদ্যাচর্চ্চা এবং উচ্চ দরের কোন কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্গে আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রচলিত আচার ব্যবহারকে ধর্ম্ম এবং মোক্ষ বলিয়া প্রচার করিতেন, অপর দিকে অজ্ঞানান্ধ সাধারণ নরনারী ইহলোকের পার্থিব ভোগবাসনার পরিণত অবস্থাকে স্বর্গ কল্পনা করত বিষয়লালসা ও মায়াবন্ধনে দৃঢ়রূপে বদ্ধ হইয়া তাঁহাদের পথ অনুসরণ করিত, মধ্যবিধ অর্দ্ধশিক্ষিত ভদ্রসমাজ এই সকল ধর্ম্মের আমোদ আহ্লাদ পান ভোজনের অংশ গ্রহণ করিয়া সুখী হইত। প্রকৃত বিশ্বাস ভক্তি ধর্ম্মানুষ্ঠান অতি অল্প লোকের মধ্যেই ছিল। দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত কেহ কোন নিয়মের অন্যথাচরণ করিলে তজ্জন্য কঠোর প্রায়শ্চিত্তবিধি প্রচারিত ছিল। ভিতরে ভিতরে অনেকেই অনেক নিয়ম ভাঙ্গিতেন, প্রকাশ হইলেই তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। ব্রাহ্মণের শূদ্রান্নভোজন, ব্যভিচার, মিথ্যাকথন, সাক্ষ্যদান, শূদ্রের দান প্রতিগ্রহণ, ভিন্ন জাতীয় ব্যবসায় অবলম্বন ইত্যাদি কার্য্য নিষিদ্ধ, কিন্তু বিধি অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিলে এ সকল কার্য্যে বিশেষ আপত্তি থাকিত না। একবার প্রকাশ্যরূপে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পরে যাহা ইচ্ছা করিতে পার, এই প্রচলিত বিধি; এ বিষয়ে সে কালে এবং এ কালে কোন বিশেষ প্রভেদ দেখা যায় না। মিথ্যা কথা বলিলে নরক হয়, কিন্তু অবস্থাবিশেষে তাহা বলিবে। অন্যায় উপার্জ্জিত ধনের

কিয়দংশ যদি দেবদেবীপূজায়, ব্রাহ্মণভোজনে, কিংবা দাতব্যকার্য্যে ব্যয় করা যায়, তবে তাহাতে আর কোন দোষ স্পর্শে না। যজমানেরা যত পাপ কেন করুক না, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গুরু পুরোহিত সে সমস্ত আপনাদের মস্তকে লইতে পারেন, যদি উচিত মত তাঁহাদের সেবার ব্যবস্থা হয়। এমন সকল পুণ্য কার্য্য তাঁহারা দেখাইয়া দিতেন, যাহা করিলে কোটি জন্মের পাপ ভস্ম হইয়া যাইবার কথা। একবার কোন বিশেষ পর্ব্বে, বা চূড়ামণিযোগে গঙ্গাস্নান করিয়া কিংবা গ্রহণের সময় পুরশ্চরণ করিয়া তাহার পর পাপ পুণ্যের জমা খরচ কাটিয়া দেখ, পুণ্য চিরকাল ফাজিল দাঁড়াইবে! একবার গঙ্গায় অবগাহন করিলে যদি কোটি জন্মের পাপ ক্ষয় হয়, তবে তুমি কত পাপ করিবে? এ প্রকার পুণ্যকার্য্য শত শত ছিল, যাহা অতি সহজে লোকে সম্পন্ন করিতে পারিত। ধর্ম্মনিয়ম, সমাজশাসন যেমন একদিকে কঠোর এবং অলঙ্ঘনীয়, অন্যদিকে আবার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা তাহা অপেক্ষা অনন্ত গুণে সহজ, এই জন্য কাহারো কোন কষ্ট হইত না। প্রায়শ্চিত্ত বিধির সুদৃঢ় বন্ধন, সহজসাধ্য পুণ্য কর্ম্মের দ্বারা এমনি শিথিল হইয়া গিয়াছিল যে, লোকে পাপ করিয়া সঞ্চিত পুণ্যকে নিঃশেষ করিতে পারিত না। মনু বলিয়া গিয়াছেন, "কৃত্বা পাপংহি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে। নৈবং কুর্য্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে তু সঃ॥" অর্থাৎ পাপ করিয়া তন্নিমিত্ত সন্তাপ করিলে সেই পাপ হইতে মনুষ্য মুক্ত হয়। এমত কর্ম্ম আর করিব না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলে সে পবিত্র হয়। "অজ্ঞানাদ্ যদি বা জ্ঞানাৎ কৃত্বা কর্ম্ম বিগর্হিতং। তস্মাদ্ বিমুক্তিমন্বিচ্ছন্ দ্বিতীয়ন্ন সমাচরেৎ॥" কোন ব্যক্তি অজ্ঞাতসারে পাপাচরণ করিয়া তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করিলে সে আর দ্বিতীয় বার তাহা করিবে না। কিন্তু এ কথা কয় জন ব্যক্তি মানিবে? এমন অবস্থায় কেহ যদি হঠাৎ আসিয়া বলে যে সংসারবাসনা ছাড়িয়া বৈরাগী হও, চরিত্রকে পবিত্র কর, প্রেম ভক্তিতে মাত, সাধুসঙ্গে হরিনাম কীর্ত্তন কর, তাহা হইলে সে ব্যক্তিকে যে নিতান্ত উপেক্ষিত অনাদৃত হইতে হইবে তাহার আর বিচিত্র কি? মহাত্মা চৈতন্যের সময় ঠিক এইরূপ ছিল। বামাচারী ভক্তিবিরোধী হিন্দুগণ এক অদ্ভুত জীব ছিলেন। তাঁহাদের

কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা, গলে রুদ্রাক্ষমালা, হস্তে সুরাপূর্ণ নর-কপাল, গাত্রে কালীনামাঙ্কিত নামাবলী; যখন মদ্যমাংসাদি পঞ্চমকারের সেবার্থ ভৈরবীচক্রে তাঁহারা উপবেশন করিতেন, তখনকার ভীম মূর্ত্তি দেখিলে হৃৎকম্প হইত। সুরাপান করিয়া ইঁহারা রাক্ষসের ন্যায় পথে পথে বিচরণ করিতেন। কেহ কেহ বলিতেন, আমরা সুরাকে গঙ্গাজল, এবং মাংসকে জবাফুল করিতে পারি। তাঁহাদিগকে আর আর সকলে সিদ্ধ পুরুষ বলিত; সিদ্ধ পুরুষদের কিছুতেই নেশা ধরিত না। ভৈরবীচক্রের গুণে বস্তুর ভেদাভেদ বোধশক্তি যখন চলিয়া যায়, তখন এইরূপ বোধ হওয়া কিছু আশ্চর্য্যজনক নহে। শক্তি উপাসনার সমধিক প্রাবল্য হেতু সে সময় অনেক লোক মাংসাশী হইয়াছিল। যাহারা নিতান্ত ষণ্ডামার্ক তাহারা নেশার ঝোঁকে কখন কখন কৃষ্ণবর্ণ কুকুর দুই একটা ধরিয়া টানাটানি করিত। বামাচারীরা ব্যভিচারে লিপ্ত থাকিয়াও তাহা পাপ বলিয়া বুঝিতে পারিত না।

এক দিকে ব্রাহ্মণত্বের গৌরব, জাত্যভিমান, মায়াবাদের কঠোর ধর্ম্মমত, তার্কিকতা, অসার ধর্ম্মাভিমান; অপর দিকে ধর্ম্মযাজকদিগের কপট ব্যবহার, স্বার্থপরতা, বামাচারীদিগের পঞ্চমকার, এবং সাধারণ লোকের সাংসারিকতা, কুসংস্কার, অজ্ঞানতা, প্রেমভক্তিবিহীনতা, ইহারই মধ্যে ভক্তিভাজন চৈতন্য দেব জন্মগ্রহণ করিলেন। সে সময়ে নবদ্বীপে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ যে কয় জন লোক ছিলেন তাহার মধ্যে অদ্বৈত আচার্য্য প্রধান। নিবাস ইঁহার শান্তিপুরে,কিন্তু নবদ্বীপেও মাঝে মাঝে তিনি থাকিতেন। আর শ্রীহট্ট প্রদেশের শ্রীবাস এবং শ্রীরাম পণ্ডিত, চন্দ্রশেখর দেব এবং মুরারি গুপ্ত। এই চারি জন এবং চট্টগ্রামবাসী বাসুদেব দত্ত ও পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি; এই কয় ব্যক্তি ভক্তিশাস্ত্রের আলোচনা করিতেন। ইঁহারা সকলেই পরম বৈষ্ণব ছিলেন। হরিভক্তি যে তখন একেবারে ছিল না, তাহা নহে। শ্রীকৃষ্ণই ভক্তির প্রথম প্রবর্ত্তক, গীতা ও ভাগবতোক্ত ভক্তির কথা সকল তাঁহারই মুখবিনির্গত। অর্জ্জুন ও উদ্ধবের সঙ্গে তাঁহার এ বিষয়ে যে কথা বার্ত্তা হয় তাহা অতি মনোহর। পূর্ব্বকালে ব্যাস, নারদ, যুধিষ্ঠির অম্বরীষাদি দেবর্ষি মহর্ষি রাজর্ষিগণের ও ধ্রুব প্রহ্লাদের এবং পরে দাক্ষিণাত্য

প্রদেশে মধ্বাচার্য্য এবং রামানুজ সম্প্রদায়ে যে ভক্তিভাব ছিল তাহার কিঞ্চিৎ আভাস এ সময় বঙ্গদেশেও দেখা যাইত। তদ্ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনবিহার হইতেও এ দেশে নানা স্থানে সরস ধর্ম্মভাব অনেক পরিমাণে প্রচারিত হয়। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম, বৈদিক অদ্বৈতবাদ এবং মুসলমানদিগের কঠোর রাজশাসনে সে ভাব বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছিল। যে কয় জন বৈষ্ণবের নাম উপরে উল্লিখিত হইল, ইহাঁরা শাক্তদিগের ভয়ে অতি সংগোপনে সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। যবন হরিদাস এই সময়ের লোক। তাঁহাদিগের উপর শাক্তেরা ভয়ানক উৎপাত করিত। শক্তিউপাসকদিগের দল বল বেশী ছিল, তাহাদের ভয়ে হরিভক্তি লোকের মনে স্থান পাইত না। লোকের দুর্ম্মতি ধর্ম্মভ্রষ্টতা কপটাচার দেখিয়া অদ্বৈতাদি ভক্তগণ এইরূপ প্রার্থনা করিতেন যে "হায়! ভগবান্ ভক্তি দিয়া জীবগণকে কবে উদ্ধার করিবেন? কবে তিনি অবতীর্ণ হইবেন?" অদ্বৈত এক দিন মনের দুঃখেতে অত্যন্ত কাতর হইয়া উপবাস করিয়াছিলেন। এমন সময় সেই লুপ্তপ্রায় ভক্তিকে উদ্ধার করিবার জন্য চৈতন্য দেব নবদ্বীপে অবতীর্ণ হন।

ঘোর অনাবৃষ্টির পর জলপ্লাবনের ন্যায় চৈতন্যের জীবনরূপ ভক্তিরসের উৎস উৎসারিত হইয়া বঙ্গসমাজকে প্লাবিত করিল। ভূতভাবন ভগবান্ যেমন পৃথিবীকে ফল শস্য জীবন জ্যোতিতে সজ্জিত করিবার জন্য সূর্য্যরশ্মি দ্বারা ধরাতলস্থ মলিন জঞ্জালরাশি হইতে বাষ্পনিষ্কর্ষণ পূর্ব্বক তাহাকে মেঘরূপে পরিণত করত সুশীতল বারিধারা বর্ষণ করেন, তেমনি তিনি পাপীর গতি হইয়া আবার যথাসময়ে মনুষ্যকৃত রাশি রাশি পাপ দুর্গন্ধের মধ্য হইতে স্বীয় পুণ্যবলে ভক্ত মহাপুরুষদিগকে উৎপাদন করত ধর্ম্মবিপ্লব ঘটাইয়া দেন। তাঁহার ভক্ত তাঁহার কৃপাবলে নির্ম্মল ভক্তিবারি বর্ষণপূর্ব্বক জীবদিগের হৃদয়ক্ষেত্র হইতে নানাবিধ ভাবকুসুম এবং পুণ্যফল বিকাশ করিয়া তাঁহারই মঙ্গল চরণে পুনরায় তাহা উপহাররূপে প্রদান করিয়া থাকেন। চৈতন্যদেব এই প্রেমের উদ্যান হইতে যে এক অপূর্ব্ব পুষ্পস্তবক রচনা করিয়াছিলেন তাহার মধুর আঘ্রাণ এখনও ভক্তসমাজকে আমোদিত করিতেছে। তাঁহার অভ্যুদয়ে ভক্তিসমুদ্র প্রভূত বেগে উদ্বেলিত হইল, এবং তাহার এক প্রকাণ্ড ঢেউ আসিয়া কঠোর কুতার্কিক পাষণ্ড বিষয়ী বামাচারী মদ্যপায়ী সকলকে সবলে আঘাত করিল। একা গৌরাঙ্গের ভক্তিপ্রস্রবণ হইতে শত শত ভক্তিনদী সংরচিত হইয়াছে।

তাঁহার ধর্ম্ম যে কেবল শুষ্ক হৃদয় বৈদান্তিক এবং জ্ঞানী কর্ম্মীদিগের বিষম শত্রু হইয়াছিল তাহা নহে, মদ্যমাংসসেবী তান্ত্রিকদিগের পক্ষেও ইহা কাল-স্বরূপ হইয়াছিল। তিনি যদি লক্ষ লক্ষ নর নারীকে বৈষ্ণব করিয়া না যাইতেন, তাহা হইলে এত দিন অজাবংশের চিহ্ন পর্য্যন্ত এ দেশে থাকিত না, লোকের মন নরম হইত না, এবং সুরাস্রোতে বঙ্গদেশ ডুবিয়া যাইত। এইরূপ প্রতিকূলতার মধ্যে ভক্তচূড়ামণি গৌরাঙ্গদেব নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া অজ্ঞান দীন দুঃখী সাধারণ নরনারীর তৃষিত প্রাণ ভক্তিরসে শীতল করিলেন।

বাল্যকাল ও পাঠ্যাবস্থা।

১৪০৭ শকে [ইংরাজি ১৪৮৫ অব্দে] বৈদিক ব্রাহ্মণকুলে জগন্নাথ মিশ্রের ঔরসে, শচীদেবীর গর্ভে চৈতন্য জন্মগ্রহণ করেন। দেশীয় প্রথা এবং তৎকালপ্রচলিত বিশ্বাসানুসারে সে দিন অতি শুভ দিন ছিল। ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে সিংহরাশি সিংহলগ্নে সন্ধ্যাকালে তাঁহার জন্ম হয়। জগন্নাথ মিশ্রের পূর্ব্ব নিবাস শ্রীহট্ট দেশে, গঙ্গাস্নান উপলক্ষে নবদ্বীপে আসিয়া তিনি বাস করেন। তখন পূর্ব্বদেশের অনেক লোক টোলে অধ্যয়ন এবং গঙ্গাস্নান করিবার জন্য এখানকার উপনিবাসী হইয়া থাকিতেন। শচীর ক্রমাগত আটটী কন্যা হইয়া মরিয়া যায়, পরে বিশ্বরূপ নামে এক পুত্র সন্তান জন্মে। চৈতন্য দশম গর্ভের শেষ সন্তান। জগন্নাথ মিশ্র এক জন সামান্য অথচ সম্ভ্রান্ত ভদ্র গৃহস্থ ছিলেন। তিনি নবদ্বীপের নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যাকে বিবাহ করেন। বোধ করি সেই উপলক্ষে এখানে তাঁহার বাস। দশম গর্ভ ধারণ করিয়া শচীদেবীর অপূর্ব্ব লাবণ্য হইল। কথিত আছে, তের মাস গর্ভে থাকিয়া চৈতন্য ভুমিষ্ঠ হন। চৈতন্যের জন্ম দিনে চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল। সেই উপলক্ষে গঙ্গায় স্নান করিবার জন্য রাঢ় বঙ্গ হইতে বিস্তর লোক নবদ্বীপে আসে, এবং তাহারা হরিধ্বনিতে গ্রামকে পরিপূর্ণ করে। এই গ্রহণের উপলক্ষে যবনেরা পর্য্যন্ত উপহাসচ্ছলে হরিনাম করিয়াছিল। সেই পবিত্র হরিনামের ধ্বনির মধ্যে হরিগতপ্রাণ চৈতন্য জন্মিলেন। সন্তানের অসাধারণ রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া শচী মাতা এবং মিশ্র ঠাকুর আনন্দে ভাসিতে লাগিলেন। জন্ম দিবস হইতেই তাঁহাতে অসাধারণ দেবলক্ষণ সকল দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ দিন নানা স্থান হইতে লোকেরা উপহার যৌতুক লইয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিল। সন্তানের মনোহর শ্রী সন্দর্শনে তাঁহাকে অলোকসামান্য পুরুষ বলিয়া সকলে স্থির করিয়াছিলেন। স্বর্গ হইতে কোন দেবতা আসিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এই বিশ্বাসেই সকলে তাঁহাকে বিবিধ উপহার প্রদান করেন। এ কথা নিতান্ত অযোগ্যও নহে। তাঁহার জন্ম যে দেবাংশে তাহাতে আর কোন সন্দেহ হইতে পারে না। মিশ্র ঠাকুর ছেলের কল্যাণে অনেক সামগ্রীপত্র

পাইয়াছিলেন। এবং তাহা লোকদিগকে বিতরণ করিয়া দিয়াছিলেন। পুত্রের অদ্ভুত লক্ষণ দেখিয়া নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী তাঁহার নাম বিশ্বম্ভর রাখিলেন। অন্নপ্রাশনের দিন যে সকল পদার্থ ছেলেকে স্পর্শ করিতে দেওয়া হয়, লোকে বলে যে তাহার মধ্যে ভাগবত গ্রন্থ লইয়া তিনি খেলা করিয়াছিলেন। ক্রমে শিশু দিন দিন শশিকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বিশ্বম্ভর যখন কাঁদিতেন তখন স্ত্রীলোকেরা হাততালি দিয়া হরি হরি বলিত, আর অমনি তিনি হাসিয়া তাহাদের কোলে গিয়া ঝাঁপ দিয়া পড়িতেন। ক্রমে ইহা একটি তামাসার বিষয় হইয়া উঠিল। অনেকে ইহা দেখিবার জন্য মিশ্র ভবনে উপনীত হইত। হরি বলিলে হাসিতেন এবং বর্ণ খুব ফুট ফুটে কাঁচা সোণার মত ছিল এই জন্য পাড়ার মেয়েরা তাঁহাকে গৌরহরি বলিয়া ডাকিতে লাগিল। এবং ডাকিনী যোগিনীর ভয়ে নিমাই নাম রাখা হইয়াছিল। এই তিন নামেই তিনি সম্বোধিত হইতেন।

গৌরাঙ্গ যেমন সুন্দর ছেলে ছিলেন, তেমনি আবার চঞ্চল অস্থির এবং দুষ্টও বিলক্ষণ ছিলেন, এক দণ্ডও প্রায় ঘরে থাকিতেন না। প্রতিবাসীদিগের বাড়ীতে গিয়া বড় উৎপাত করিতেন। কাহারো ছেলে কাঁদাইতেন, কাহারো ঘরে প্রবেশ করিয়া খাদ্য সামগ্রী লইয়া পলাইতেন; ধরা পড়িলে আবার লোকের নিকট ক্ষমা চাহিতেন। একবার এক জন অতিথি তাঁহাদের বাড়ীতে আসিয়াছিল। সে ব্রাহ্মণ তিন বার ক্রমাগত ভাত রাঁধিয়া পাতে ঢালিল; যাই সে চক্ষু বুঁজিয়া দেবতাকে নিবেদন করিতে বসে, আর চৈতন্য তাহা খাইয়া ফেলেন। এক দিন দুই জন চোর তাঁহাকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল, শেষ ঘুরিতে ঘুরিতে মিশ্র ভবনে আসিয়া উপস্থিত হয়। গায়ের অলঙ্কার লইবার ইচ্ছায় তাহারা সন্দেশ দিয়া তাঁহাকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিল; কিন্তু কোথায় কিরূপে তাঁহাকে মারিবে এই ভাবনায় এবং বালকের মনোহর সুন্দর কান্তি দর্শনে তাহারা পথ ভুলিয়া যায়। চৈতন্য গঙ্গাস্নানে গিয়া লোকের উপর বড়ই উপদ্রব করিতেন। ডুব দিয়া কাহারো পা ধরিয়া টানিতেন, স্ত্রী পুরুষ উভয়ের শুষ্ক বস্ত্র এক জায়গায় গোলমাল করিয়া রাখিতেন, লোকের পায়ে বালি ও কুলকুচার জল দিতেন, কাহারো ঘাড়ে চড়িতেন, জল ছিটাইয়া দিয়া কাহারো বা ধ্যান ভঙ্গ করিতেন। ছোট ছোট বালিকা এবং মেয়ে ছেলে সকলকেই যেন

উস্তং ফুস্তং করিয়া তুলিতেন। এজন্য বালিকাগণ শচীর নিকট অভিযোগ করিতে আসিত, তিনি মিষ্ট কথা বলিয়া তাহাদিগকে ভুলাইতেন।

এক দিন মিশ্র মহাশয় পাড়ার লোকেদের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া দুঃখিত হন এবং ক্রোধে অস্থির হইয়া ছেলেকে শাসন করিবার জন্য ছড়ি হাতে করিয়া গঙ্গাতীরে গমন করেন। গৌরাঙ্গ ছোট ছোট বালিকাদিগকে উপহাস পূর্ব্বক বলিতেন, তোমরা আমাকে পূজা কর, আমি তোমাদিগকে বর দিব; এই বলিয়া পূজার ফুল চন্দন দ্বারা নিজের অঙ্গ সাজাইতেন, নৈবেদ্য খাইয়া ফেলিতেন, আর মেয়েরা রাগিয়া মরিত। কেহ বা নাকে কাঁদিত এবং বকিত। তাহারা বলিত নিমাই, তুমি গ্রামসম্পর্কে আমাদের ভাই হও, এমন কি করিতে আছে? বালিকাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নিমাই বলিতেন, তোমাদের পরম সুন্দর পণ্ডিত স্বামী হইবে, চিরায়ু মতিমান্ সাত পুত্র হইবে। এ সকল কথায় মনে মনে আহ্লাদিত হইয়া তাহারা আরো কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিত। যে যে কন্যা নৈবেদ্য দিত না, তাহাকে কহিতেন, তোমার বৃদ্ধ পতি ও চারিটী সতিনী হইবে। ইহা শুনিয়া ভয়ে কেহ কেহ বা আপনা হইতেই নৈবেদ্য আনিয়া তাঁহাকে দিত। এই বালকের কেমন এক আকর্ষণী শক্তি ছিল, নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য করিলেও কেহ তাঁহাকে মন্দ বলিত না। এই সকল দৌরাত্ম্য অস্থিরতার মধ্যে হরিনামে তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছিল। যে সকল মেয়েরা হরিগুণ গান করিতে জানিত, নিমাই তাহাদের নিকট যাইতেন এবং তাহাদিগকে ভাল বাসিয়া খৈ কলা সন্দেশ অন্য স্থান হইতে আনিয়া দিতেন। সমবয়স্ক বালকগণের মধ্যে তিনি প্রধান হইয়া সকলকে চালাইতেন, অপর বালকগণ তাঁহাকে যথেষ্ট ভাল বাসিত। নিমাইয়ের দৌরাত্ম্যের কথা শুনিয়া শচীদেবী এক আধ বার ছেলেকে ধমক ধামক দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল উৎপন্ন হয়; শেষে আর কিছুতেই তাঁহাকে তিনি আঁটিতে পারিতেন না। কিছু বলিলে নিমাই বাড়ীর দ্রব্য সামগ্রী ভাঙ্গিয়া মহা গণ্ডগোল বাধাইতেন। এক দিন রাগ করিয়া আঁস্তাকুড়ে অস্পৃশ্য হাঁড়ি কলসীর মধ্যে গিয়া বসিলেন। শচী দেখিয়া মহা দুঃখিত হইয়া তাড়না করিয়া বলিতে লাগিলেন, গঙ্গাস্নান করিয়া আইস, তাহা না হইলে ভাত খাইতে পাবে না। নিমাই আর এক দিন ঘরের ঠাকুরগুলিকে ফেলিয়া দিয়া সিংহাসনের উপর

নিজে বসিয়াছিলেন। এক দিন ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে গঙ্গা-তীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীর সঙ্গে তাঁহার বাল্যপ্রণয়ের সঞ্চার হয় এবং উভয় উভয়কে সুনয়নে দেখিয়া পরস্পর প্রণয়পাশে বদ্ধ হন। নিমাই কাহাকেও ভয় করিতেন না, কেবল অগ্রজ বিশ্বরূপকে দেখিলে চুপ করিয়া থাকিতেন। তিনিও ছোট ভাইয়ের মহৎ লক্ষণ সকল দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন।

জগন্নাথ মিশ্র পুত্রকে উপযুক্ত বয়সে তৎকালপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট ব্যাকরণশিক্ষার্থ প্রেরণ করেন। নিমাই পাঠ আরম্ভ করিয়া যাহা একবার শুনিতেন তাহা আর ভুলিতেন না। তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি এবং প্রতিভা দেখিয়া পণ্ডিত বলিতেন এ ছেলে ক্ষণজন্মা। অতঃপর তিনি দৈববলে ভিতরে ভিতরে এক জন মহাপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। পুত্রের অসাধারণ জ্ঞানোন্নতির কথা শ্রবণে মিশ্র মহাশয় কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া অমঙ্গল আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, বিশ্বরূপ অল্প বয়সে জ্ঞানী হইয়া সংসার পরিত্যাগ করিল, নিমাইকে তবে আর পড়িতে দিব না; ছেলে যদি মূর্খ হইয়া ঘরে থাকে সেও ভাল। নিমাই আমার যদি কৃষ্ণভক্তি উপার্জ্জন করিতে পারে তাহা হইলেই সে চিরসুখী হইবে, বিদ্যাতে ধনেতে কেহ সুখী হইতে পারে না। স্ত্রী পুরুষে এক মত হইয়া কিছু দিন পড়া বন্ধ করিলেন। শেষ ছেলের দৌরাত্ম্যে এবং প্রতিবাসীদিগের ভৎর্সনায় তাঁহাকে টোলে পাঠাইতে বাধ্য হন। এই সময় বিশ্বম্ভরের যজ্ঞোপবীত হয়। উপবীত ধারণ করিয়া ইহাঁর আর এক প্রকার সৌন্দর্য্য হইল। উপবীতের পর নিমাই ব্রাহ্মণের প্রথানুসারে প্রতি দিন বিষ্ণুপূজা করিতেন। জগন্নাথ মিশ্রও এক জন বিষ্ণূপাসক সাত্বিক লোক ছিলেন, বিশেষতঃ চৈতন্যের জন্ম হইতে স্বামী স্ত্রী উভয়েরই ধর্ম্মে মতি কিছু অধিক হইয়াছিল। যে বংশে ভক্তপুত্র জন্মে সে বংশ উদ্ধার হইয়া যায়। ভাল ছেলে বাস্তবিক গুরু। সৎপুত্র পিতা মাতার স্বর্গগমনের সোপান।

১৪২২ শকে অর্থাৎ ইংরাজি পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাসুদেব সার্ব্বভৌম নামক এক জন তর্কশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত নবদ্বীপের নিকট বিদ্যানগর গ্রামে এক চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে অদ্যাপি গৌরাঙ্গের বিগ্রহ-মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। তাঁহার প্রধান ছাত্র চৈতন্য, রঘুনাথ শিরোমণি,

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য, স্মার্থ ভট্টাচার্য্য, হরিদাস সার্ব্বভৌম এবং শ্রীপাদ গোস্বামী এই কয়েক জন। ইহাঁদের মধ্যে আবার চৈতন্য, রঘুনাথ এবং রঘুনন্দন প্রসিদ্ধ ছিলেন। ক্রমে নিমাই সাহিত্য কাব্য শ্রুতি স্মৃতি জ্যোতিষ দর্শন প্রভৃতি বিদ্যায় সুপণ্ডিত হইলেন, কিন্তু তিনি ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্রেই বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সন্তানকে বিদ্যা উপার্জ্জনে প্রগাঢ় মনোযোগী দেখিয়া শচী ঠাকুরাণীর মনে আশা হইল যে, তবে আর আমার নিমাই উদাসীন হইবে না।

যৌবন ও অধ্যাপনের কাল।

গৌরাঙ্গ যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিলেন। স্বাভাবিক দৈহিক সৌন্দর্য্যের উপর বিদ্যার জ্যোতি প্রতিফলিত হওয়াতে তাঁহার রূপ ও গুণ উভয়ই অতি মনোহর হইল। সেরূপ দেখিবামাত্র লোকের মন আকৃষ্ট হইত। যে পথ দিয়া তিনি যাইতেন সেখানকার লোকেরা তাঁহার পানে একবার না চাহিয়া থাকিতে পারিত না। এ সময় তিনি সদা সর্ব্বদা ছাত্রদিগের সঙ্গে বিদ্যাচর্চ্চায় নিযুক্ত থাকিতেন।

এক দিন নিমাই শচীকে হঠাৎ বলিলেন "মা! আপনি একাদশীর দিনে আর অন্ন আহার করিবেন না।" শচীদেবী সেই দিন হইতে একাদশী ব্রত আরম্ভ করেন। ইহা দ্বারা যে তাঁহার অন্তরস্থ হরিভক্তির আভাস প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা এখন বেশ বুঝা যাইতেছে। গৌরাঙ্গের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ এক জন অতি শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন, কোন গোলমালের মধ্যে বড় একটা মিশিতেন না, পড়া শুনা, গৃহকর্ম্ম কিছুতেই তাঁহার অনুরাগ ছিল না, কেবল পূজা অর্চ্চনা হরিভক্তি আলোচনা সাধুসঙ্গ ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ ইহাতেই মগ্ন থাকিতেন। তিনি অদ্বৈতভবনে ভক্তগণের সহবাসে সর্ব্বদা তত্ত্বজ্ঞান ও ধর্ম্মালোচনা করিতেন এবং এক জন ধর্ম্মানুরাগী ভক্ত ছিলেন। গৌর সময়ে সময়ে ঐ স্থানে গিয়া জ্যেষ্ঠকে ডাকিয়া আনিতেন। পথে দুই ভ্রাতায় যখন হাত ধরাধরি করিয়া যাইতেন তাহা দেখিয়া লোকে মুগ্ধ হইত। কারণ, দুই জনেরই রূপ লাবণ্য ভাব ভঙ্গী অতিশয় মনোহর ছিল। মিশ্র মহাশয় বিশ্বরূপের যৌবনকাল উপস্থিত দেখিয়া তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব করেন। ইহা শুনিয়া সেই যুবা আর ঘরে রহিল না, শঙ্করারণ্য নামক এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে একবারে সন্ন্যাসী হইয়া গোপনে তীর্থ পর্য্যটনার্থ চলিয়া গেল। এই ঘটনায় জগন্নাথ মিশ্র এবং শচীদেবী অত্যন্ত কাতর হন এবং পুত্রবিরহে বহু বিলাপ করেন। নিমাইও ভ্রাতৃশোকে অধীর ও নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পিতা মাতার শোকদগ্ধ হৃদয়ে শান্তি দিবার জন্য বলিলেন, বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হইয়াছেন ভালই হইয়াছে,

তাঁহা দ্বারা পিতৃকুল উদ্ধার হইল, আমি একাই আপনাদের চরণ সেবা করিব। পুত্রের এই মিষ্ট বাক্য শুনিয়া তাঁহারা কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন। বিশ্বরূপের সন্ন্যাসী হওয়া শুনিয়া গ্রামস্থ সকলেই দুঃখিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ অদ্বৈতাদি বৈষ্ণবেরা তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন, এই জন্য তাঁহাদের হৃদয় অতিশয় ব্যথিত হয়।

কিয়দ্দিবসান্তে জগন্নাথ মিশ্রের পরলোক হইল, ইহাতে শচীদেবী আরও কাতর হইয়া পড়িলেন; একটি মাত্র অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র, তাদৃশ বিষয় বিভবও ছিল না, নানা দুশ্চিন্তায় তাঁহার অন্তঃকরণ ভাঙ্গিয়া গেল। গৌর বিধিপূর্ব্বক পিতৃশ্রাদ্ধ সমাপন করিয়া পরে সংসার ধর্ম্মপালনে নিযুক্ত হইলেন। শচী যখন পতিশোকে কাতর হইয়া নিজের নিরাশ্রয় অবস্থা স্মরণ পূর্ব্বক খেদ করিতেন তখন নিমাই আশ্বাস দিয়া বলিতেন, "মা! ভয় কি? সেই দীনবন্ধুই আমাদিগকে রক্ষা করিবেন, তাঁহার চরণ পাইলে সকল দুঃখ ঘুচিবে, আমি তোমাকে সেই দেবদুর্ল্লভ চরণ আনিয়া দিব। বিধাতার বিধাতৃত্ব শক্তিতে তাঁহার প্রগাঢ় নির্ভর ছিল। শোকাতুরা মাতাকে এইরূপে তিনি অনেক সময় সান্ত্বনা প্রদান করিতেন। এ সময় তিনি কিছু শান্ত গম্ভীর হন; মাতার কাছে সর্ব্বদা থাকিতেন এবং পড়া শুনা করিতেন। গৃহিণী ব্যতীত গৃহধর্ম্ম পালন হয় না, এই ভাবিয়া গৌরের বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইল। এক দিন অধ্যয়ন করিয়া বাড়ী আসিতেছিলেন, হঠাৎ পথিমধ্যে সেই লক্ষ্মী নাম্নী সুন্দরী কন্যাটীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল; উভয় উভয়কে দর্শন করিয়া প্রীতিরসে অভিষিক্ত হইলেন। তদনন্তর বনমালী ঘটক শচীর আদেশানুসারে বিবাহের কথা বার্ত্তা সকল স্থির করেন। শুভ দিনে বিশ্বম্ভর ধর্ম্মপরায়ণ বল্লভাচার্য্যের কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। যখন পুত্রের বিবাহ হইল তখন শচীদেবী এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইলেন, নিমাই আর যে গৃহত্যাগী হইবেন না তদ্বিষয়ে তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল।

বিবাহের পর গৌরচন্দ্র চতুষ্পাঠী স্থাপন পূর্ব্বক অধ্যাপনার কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। শত শত শিষ্য বিদ্যার্থী হইয়া তাঁহার নিকট পড়িতে আসিত। নিমাই পণ্ডিতের শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলে অবাক্ হইয়া যাইত। অল্প দিনের মধ্যে দেশে বিদেশে সকলে জানিল যে, নিমাই এক জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হইয়াছেন। অনেকানেক অধ্যাপক ইহার নিকট

শাস্ত্রবিচারে পরাজিত হইতে লাগিলেন। একে যৌবনের উষ্ণতা তাহাতে বিদ্যার গর্ব্ব, গৌরের মুখের কাছে কেহ আর দাঁড়াইতে পারে না। কিন্তু তিনি চিরকাল প্রিয়দর্শন মিষ্টভাষী ছিলেন, এইজন্য তাঁহার নিকট বিচারে পরাস্ত হইয়াও কেহ তাদৃশ দুঃখিত হইত না। নিমাই কখন কখন শিষ্যগণসঙ্গে গঙ্গাস্নানে গিয়া সাঁতার খেলিতেন এবং যৌবনসুলভ বহুল চপলতা প্রকাশ করিতেন। নবদ্বীপে তখন টোল এবং ছাত্রসংখ্যা বিস্তর ছিল। সে সময় কলেজ স্কুল আরম্ভ হয় নাই, কাজেই ভদ্রসন্তানেরা অধিকাংশ এই খানে আসিয়া সংস্কৃত পড়িত। ইহারা সকলে দলবদ্ধ হইয়া গঙ্গাস্নানে গিয়া পরস্পরে বিবাদ বিসংবাদ এবং শেষে মারামারি পর্য্যন্ত করিত। গৌরাঙ্গ একজন এ বিষয়ে প্রধান ছিলেন। শত শত ছাত্র মিলিত হইয়া স্নানার্থী স্ত্রী পুরুষদিগকে অস্থির করিয়া তুলিত।

অধ্যাপনাকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার পর যখন ক্রমে নিমাই পণ্ডিতের নাম চারি দিকে প্রচারিত হইল তখন তিনি নানা স্থান হইতে নিমন্ত্রণ পত্র পাইতে লাগিলেন। তাঁহার মুখে শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিবার জন্য অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করিত। ফলে নিমাই পণ্ডিত এক জন অদ্বিতীয় প্রভাবশালী অধ্যাপক হইয়া উঠিলেন। তর্কশাস্ত্র এবং দর্শনশাস্ত্রেও তিনি বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। বড় বড় দিগ্‌গজ পণ্ডিতদিগকে এমনি পরাস্ত করিতেন যে লোকে দেখিয়া বিস্মিত হইত। তাঁহার তর্কজালে এবং বিঘূর্ণিত বুদ্ধিচক্রে পড়িয়া অনেক পণ্ডিত অন্ধকার দেখিতেন। বিচারে জয়লাভ করিয়া নিমাই পণ্ডিত কিছু গর্ব্বিত এবং তর্কপ্রিয় হইয়াছিলেন। তিনি আপনার বুদ্ধি ও বিচারশক্তির উপর এত নির্ভর করিতেন যে, কাহাকেও ভয় করিয়া চলিতেন না। মহা দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেন হউন না, নিমাই পণ্ডিতের বিচারে সকলকেই পরাভব স্বীকার করিতে হইত। তাঁহার নিকট বিচারে পরাস্ত হইয়া সকলে মনে মনে বিরক্ত হইত, কিন্তু কি করিবে, কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিত না। নিমাই যাহার উপর একবার লাগিতেন তাহাকে নাকের জলে চখের জলে করিতেন; তাহার বিদ্যা বুদ্ধির অভিমান একবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইত। কিন্তু ইহার ভিতরেও তাঁহার স্বাভাবিক ঔদার্য্য এবং মহত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল। ভক্তিপথাবলম্বী যে কয়জন বৈষ্ণব ছিলেন তাঁহারা নিমাইকে ভয় করিতেন, বুদ্ধি বিদ্যায় তাঁহাকে না পারিয়া বিরক্ত হইতেন, এবং দেখা হইলে পাছে কুতর্ক উপস্থিত হয় এই জন্য তাঁহারা সে দিক্ দিয়া

চলিতেন না। শ্রীবাস, মুকুন্দ প্রভৃতি প্রাচীন বৈষ্ণবগণও পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু ইঁহারা বৃথা তর্ক করা অন্যায়, এই মনে করিয়া চৈতন্যের প্রতি বিরক্ত হইতেন। এ সময় বৈষ্ণবগণের ভক্তিনিষ্ঠা দেখিয়া নিমাই কিছু আত্মগ্লানি অনুভব করেন। ভিতরে মধুর ভক্তির ভাব ছিল কি না, কিছু দিনের জন্য শাস্ত্রচর্চ্চায় কেবল তাহা প্রকাশ হইতে পারে নাই। এক একবার মনে বড় লাগিত; কিন্তু তখন জ্ঞানোন্মত্ততা অধিক, সুতরাং সে ভাব মনে স্থান পাইত না। শ্রীবাস কিংবা গদাধরের সঙ্গে পথে সাক্ষাৎ হইলে প্রণাম করিয়া গৌরাঙ্গ তাঁহাদের সঙ্গে তর্ক উপস্থিত করিতেন, ব্যাকরণের ফাঁকি ধরিয়া তাঁহাদিগকে কৌশলে ঠকাইতেন। কিন্তু বিশ্বম্ভরের বড় অমায়িক এবং উদার ভাব ছিল। এত বড় পণ্ডিত তর্কবাগীশ, তত্রাপি তিনি শ্রীবাসাদির মন হরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা তর্কে পরাস্ত হইয়াও গৌরের রূপ গুণে বিমুগ্ধ হওত মনে মনে কামনা করিতেন, এই যুবা যদি কৃষ্ণভক্ত হয়, তবে আরও শোভা হয়। শ্রীবাস এক দিন মুখ ফুটিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "দেখ নিমাই, কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা বুদ্ধি সকলই বৃথা। তুমি কেন মিথ্যা তর্ক বিতর্ক করিয়া বেড়াও, কৃষ্ণকে ভজনা কর।" তিনি বলিতেন, "আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমার কৃষ্ণভক্তি হয়।" তখন ভক্তির বীজ গৌরের হৃদয়মধ্যে অঙ্কুরিত হইতেছিল, কিন্তু জ্ঞানবৃক্ষের বিস্তৃত ছায়া তাহাকে কিছু দিন পর্য্যন্ত মস্তক তুলিতে দেয় নাই। শচীনন্দন যখন মহা বিজ্ঞ পণ্ডিত হইয়া দেশবিখ্যাত হইয়া পড়িলেন, তখন নবদ্বীপের আপামর সাধারণ সকলেই তাঁহাকে চিনিল। তাঁহাকে দেখিলে লোকে পাল্কী ও দোলা হইতে নামিয়া আলাপ সম্ভাষণ করিত। নিমন্ত্রণ প্রায় তাঁহার বাদ পড়িত না। বস্ত্র তৈজস বিবিধ উপহার তাঁহার বাড়ী সকলে পাঠাইয়া দিত। এমন কি তিনি মুসলমানদিগের নিকটেও সমাদৃত হইয়াছিলেন। যদিও এক জন বিখ্যাত পণ্ডিত, তথাপি যুবা প্রকৃতি বশতঃ সকল সময় গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে পারিতেন না। মন বড় শাদা ছিল, এজন্য বয়স্তদিগকে লইয়া সময়ে সময়ে আমোদ আহ্লাদ করিতেন। ছোট বড় ইতর ভদ্র সকলের বাড়ীতেই তাঁহার পদধূলি পড়িত। শ্রীধর নামে এক জন গরিব ব্রাহ্মণ কলা থোড় মোচা খোলা বিক্রয় করিয়া দিনপাত করিত। নিমাই তাহার বাড়ীতে গিয়া তাহার সঙ্গে নানাবিধ কষ্টি নষ্টি করিতেন। সে গরিব ভয়ে ভয়ে তাঁহাকে বিনা পয়সায় ঐ সকল তরকারি।

কলাপাত খোলা ইত্যাদি দিত। শ্রীহট্টবাসীদিগের সঙ্গে তিনি সেই দেশীয় ভাষায় অনেক চ্যাংড়ামি করিতেন। তাহারা ক্রোধে অগ্নি অবতার হইয়া বলিত, হয়! হয়! 'তুমি কোন্ দেশের লোক? তুমিওত শ্রীহট্টের বাঙ্গালের ছেলে।" তাহারা গৌরাঙ্গের জ্বালায় অস্থির হইয়া কখন বা তাঁহাকে ধরিয়া শিকদারের নিকট লইয়া যাইত, কখন উত্তেজিত হইয়া পশ্চাদ্ধাবিত হইত। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, এত চপলতার মধ্যে গৌরের কোন প্রকার দুরাচার দৃষ্ট হয় নাই। পরস্ত্রীর পানে ফিরিয়াও চাহিতেন না, তদ্বিষয়ে অতিশয় সতর্ক ছিলেন। মুকুন্দ সঞ্জয়ের বাড়ীতে সদা সর্ব্বদা থাকিতেন এবং তথায় বন্ধুবর্গের সহিত জ্ঞানানুশীলন করিতেন। অতিথির প্রতি তাঁহার বড় ভক্তি ছিল। ফকির সন্ন্যাসী পাইলে বাড়ীতে আনিয়া তাহাদিগের সেবা করিতেন। এক দিন নিমাই গঙ্গা পার হইতেছিলেন, সেই নৌকায় আর এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিল, কথায় কথায় দুই জনে পরস্পর আলাপ হইল। নিমাইয়ের হস্তে এক খানি পুস্তক দেখিয়া ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিল,এ খানি কি পুস্তক? নিমাই বলিলেন ইহা আমার রচিত ন্যায়শাস্ত্রের টীকা। সে কথা শুনিবামাত্র ব্রাহ্মণের মুখ খানি দুঃখেতে একবারে মলিন হইয়া গেল। নিমাই তাহা বুঝিতে পারিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করাতে ব্রাহ্মণ বলিল, আমিও একখানি টীকা রচনা করিয়াছি; কিন্তু নিমাই পণ্ডিতের টীকার নাম শুনিলে আর আমার টীকা কেহ গ্রাহ্য করিবে না। গৌরাঙ্গ তখন আপনার পুস্তক খানি নদীজলে নিক্ষেপ করিলেন। তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণের আর আনন্দের সীমা রহিল না, মহা আহ্লাদিত হইয়া নিমাই পণ্ডিতের অনেক প্রশংসাবাদ করিতে লাগিল। এ কথা যাহারা যাহারা শুনিল সকলেই গৌরের উদার ব্যবহারে বিমোহিত হইয়া গেল। বস্তুতঃ ইহা বড় সামান্য কথা নহে।

এই সময় নিমাই পণ্ডিত একবার সশিষ্য পূর্ব্বাঞ্চলে শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানে কিছু দিনের নিমিত্ত গমন করেন। যেখানে যেখানে গিয়াছিলেন, সেই থানকার লোকসকল তাঁহাকে শাস্ত্রকথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। তপন মিশ্র নামক এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে এই দেশে সাক্ষাৎ হয়। মিশ্র নিমাইকে ধর্ম্মসাধনের উপায় জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, নামসংকীর্ত্তন কর, ইহাই শ্রেষ্ঠ সাধন। ভক্তির স্রোত তখন তাঁহার ভিতরে উন্মুক্ত হয় নাই, কিন্তু তিনি প্রত্যহ রীতিমত বিষ্ণু অর্চ্চনা করিতেন।

কিছু দিন পরে নিমাই পণ্ডিত পূর্ব্বদেশ হইতে নানাবিধ সামগ্রী এবং বস্ত্রতৈজসাদি লইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। বাড়ী আসিয়া বয়স্যগণের সঙ্গে সদালাপ করিলেন। পূর্ব্বদেশের কথা শিখিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা লইয়া হাস্য পরিহাস করিতে লাগিলেন। পরে জননীর মুখে শুনিলেন যে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন স্বামীর বিরহশোকে কাতর হইয়া লক্ষ্মী প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু এ কথাও চলিত আছে, সর্পাঘাতে লক্ষ্মীর মৃত্যু হয়। শচীদেবী সহসা এই নিদারুণ সংবাদ পুত্রকে দিতে পারিলেন না, এবং তাঁহার নিকট আসিতেও সাহস করিলেন না। পরে নিমাই সমস্ত অবগত হইয়া শোক সংবরণপূর্ব্বক মাতাকে প্রবোধ দিলেন। স্ত্রীবিয়োগে যদিও তিনি নিজে শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা বাহিরে বড় প্রকাশ পাইল না।

তদনন্তর নিমাই পূর্ব্ববৎ ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কিছু দিনান্তে মাতার অনুরোধে পুনর্ব্বার তাঁহাকে সনাতন পণ্ডিতের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করিতে হইল। শচী নববধূর মুখাবলোকন করিয়া পূর্ব্বশোক বিস্মৃত হইলেন। এইরূপে নিমাই পণ্ডিত কিছু দিন সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, পণ্ডিতদিগের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক বিচার করেন, ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেন। এক দিন জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে শিষ্যবর্গ সঙ্গে জাহ্নবী তটে বসিয়া শাস্ত্রালাপ করিতেছেন, এমন সময় এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আসিয়া দাম্ভিক স্বরে বলিলেন, "ওহে নিমাই পণ্ডিত! শুনিয়াছি তুমি না কি কলাপ ব্যাকরণ পড়াইয়া থাক? তোমার শিষ্যদিগের ফাঁকির আলাপ কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি।" গৌর তাঁহাকে সম্মানপূর্ব্বক বসাইয়া বিনীত ভাবে বলিলেন, "আমি কি জানি, আপনি সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিত এবং কবি, অনুগ্রহপূর্ব্বক যদি গঙ্গার মাহাত্ম্য কিছু বর্ণনা করেন আমরা শুনিয়া সুখী হই।" দিগ্বিজয়ী দ্রুতবেগে কতকগুলি শ্লোক রচনাপূর্ব্বক পাঠ করিলেন। কিন্তু নিমাই পণ্ডিতের তর্কতরঙ্গে পড়িয়া তাঁহাকে শেষে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইল। তিনি তাহার ভিতর এমন সকল অলঙ্কার দোষ এবং অসংলগ্ন অর্থ দেখাইয়া দিলেন যাহাতে দিগ্বিজয়ীর আর বলিবার কিছু রহিল না। পরে তিনি সেই যুবকের নিকট পরাস্ত হইয়া সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া তাঁহাকে সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করেন। প্রথম যৌবনে নিমাই পণ্ডিত সর্ব্বদা জ্ঞানতরঙ্গে ভাসিতেন। বিদ্যা বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা এবং গভীরতা তাঁহার যথেষ্ট ছিল।

এই ভাবে কিছু দিন চলিতে লাগিল। অসার তর্ক বিতর্ক এবং শুষ্ক জ্ঞানালোচনায় ক্রমে নিমাই পণ্ডিতের মন কিছু কঠোর ও উদ্ধত হইয়া উঠিল। ইদানীন্তন'প্রাচীন বৈষ্ণবদিগের প্রতি কখন কখন তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। যদিও স্পষ্টরূপে তাঁহাদের বিদ্বেষী ছিলেন না, কিন্তু তাঁহাদের প্রতি বিলক্ষণ ঔদাসীন্য ভাব দেখাইতেন। ইহাতে ঐ সকল নিপীড়িত দীন হীন বৈষ্ণবগণের হৃদয় দুঃখেতে আরও অবসন্ন হইয়া পড়িল। তজ্জন্য তাঁহারা গৌরাঙ্গের প্রতি কখন কখন দোষারোপ করিতেন। এই সময় যবন হরিদাস বহু অত্যাচার সহ্য করিয়া অদ্বৈত শ্রীবাসাদির নিকট নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হন। ইহাঁর কথা শুনিলে সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন সন্দেহ নাই। যবনকুলে জন্মিয়া মুসলমান রাজার শাসনাধীনে এরূপ পরম ভাগবত ইনি কেমন করিয়া হইলেন, তাহা ভাবিয়া উঠা যায়-না। চৈতন্যের ধর্ম্মজীবনে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, সংক্ষেপে হরিদাস ঠাকুরের পরিচয় কিছু প্রদান করা কর্ত্তব্য হইতেছে।

যৎকালে প্রাচীন বৈষ্ণব কয়েক জন একত্র মিলিত হইয়া সাধুসঙ্গ সৎ প্রসঙ্গ এবং হরিসঙ্কীর্ত্তন করেন, ভক্তিহীন লোকদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া এবং ব্রাহ্মণগণের জ্ঞানাভিমান তর্ক বিতর্কে অস্থির হইয়া রোদন করেন, শাক্ত ও যবনদিগের অত্যাচারে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ইষ্ট দেবতাকে ডাকেন, তখন হঠাৎ একটি শান্তমূর্ত্তি বৃদ্ধ, হাতে হরিনামের মালা, অতি দীনবেশ, আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি হরিনামের সাগরে যেন দিন রাত্রি ডুবিয়া থাকিতেন।

যবন হরিদাস।

হরিদাসকে দেখিলে আর বোধ হইত না যে এ ব্যক্তি কোন কালে মুসলমান ছিল। হরিনামরসে ইহাঁর সর্ব্বাঙ্গ পবিত্র এবং শুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। যদিও বয়সে প্রাচীন, কিন্তু নামসঙ্কীর্ত্তনে যখন তিনি মাতিতেন তখন তাঁহার ভাবাবেশ হইত। এমনি নৃত্য করিতেন যে মাটি কাঁপিয়া যাইত। শান্তিপুর অঞ্চলে বুড়ন গ্রাম হরিদাসের জন্মস্থান। ভগবানের কৃপায় ইহাঁর হৃদয়ে হরিভক্তি সঞ্চারিত হয়। শান্তিপুরের নিকট ফুলিয়া গ্রাম, তৎসন্নিহিত বেনাপোলের বনমধ্যে এক কুটীরে হরিদাস তপস্যা করিতেন। কখন বা হরিনামরসে মত্ত হইয়া ঐ স্থানে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন। অদ্বৈতের সঙ্গে প্রথমে তাঁহার মিলন হয়, তাহাতে উভয়েই পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন। ফুলিয়ার ব্রাহ্মণ ভদ্র সকলেই হরিদাসের ভক্তি দেখিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট মান্য ও শ্রদ্ধা করিত।

যবন হইয়া হিন্দুর ধর্ম্ম আচরণ করে ইহা শুনিয়া স্থানীয় কাজী মহা বিরক্ত হইল, এবং হরিদাসকে নবাবের নিকট বন্দী করিয়া পাঠাইয়া দিল। তাঁহার প্রতি এরূপ অত্যাচারবার্ত্তাশ্রবণে তদ্দেশস্থ ধার্ম্মিক লোক মাত্রেরই মনে বড় দুঃখ হইয়াছিল। নবাবের দরবারে হরিদাস উপস্থিত হইলেন, কারাগারে প্রবেশ মাত্র বন্দিগণ তাঁহাকে প্রণাম করিল, তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "এই ভাবে অবস্থিতি কর।" কয়েদীরা ইহাতে দুঃখিত হওয়াতে হরিদাস বুঝাইয়া দিলেন যে, এখন যেমন তোমাদের মনে ভক্তির উদয় হইয়াছে এই ভাবই যেন চিরদিন থাকে। মুক্ত হইয়া পুনরায় দুষ্ট লোকদিগের সঙ্গে মিশিয়া কাহারো অনিষ্ট করিও না। তাই বলিতেছি, এই ভাবে অবস্থিতি কর।

নবাব বলিলেন হরিদাস, কেন তুমি স্বধর্ম্মত্যাগী হইয়া পরের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছ? পরলোকে কিরূপে তুমি নিস্তার পাইবে? অতএব কল্‌মা পড়িয়া প্রায়শ্চিত্ত কর। মায়ামোহিত নবাবের কথায় হাস্য করিয়া তিনি মনে মনে বলিলেন অহো! বিষ্ণুমায়া! তদনন্তর মধুর স্বরে বলিতে লাগিলেন, শুন বাপ! ঈশ্বর একই বস্তু, তিনি সকল ঘটে বিরাজ করেন। এক বস্তু

নামভেদে সকলেই মান্য করে। তিনি যাহাকে যেমন করেন সে তেমনি হয়। সকল স্থানে সেই নিত্য অখণ্ড শুদ্ধ সত্য ঈশ্বর ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। কোন প্রাণীর হিংসা করিলে তাঁহার প্রতি হিংসা করা হয়। তিনি আমাকে যেরূপ লওয়ান আমি সেই রূপ করি। ইহাতে যদি আমার দোষ থাকে বিচার কর।

নবাব হরিদাসের কথায় সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু কাজি বলিল, খোদাবন্দ! ইহাকে শাস্তি না দিলে এ ব্যক্তি আরও অনেক মুসলমানকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিবে। হয় শাস্তি দিউন, না হয় ঐ কাফের কল্‌মা পড়িয়া শুদ্ধ হউক। পুনরায় নবাব বলিলেন, ওহে ভাই, আপনার শাস্ত্র বল, নতুবা দণ্ড পাইবে। হরিদাস বলিলেন, ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ শাস্তি দিতে পারে না, কর্ম্মানুসারে লোক দণ্ড ভোগ করে। যদি আমার শরীর খণ্ড বিখণ্ড হইয়া প্রাণ বহির্গত হয়, তথাপি আমি হরিনাম পরিত্যাগ করিব না। তখন নবাব কাজির পরামর্শানুসারে আজ্ঞা দিলেন, ইহাকে বাইশ বাজারে প্রহার করিয়া মারিয়া ফেল। তাহাতেও যদি না মরে, তবে জানিবে যে, ও যাহা বলে সব সত্য।

পরে পাইকগণ হরিদাসকে বাজারে বাজারে সকলের সম্মুখে নিষ্ঠুররূপে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। অবিচারে নির্দ্দোষীর প্রাণ দণ্ড হইতেছে দেখিয়া অন্য লোকেরা কেহ নবাব ও উজিরকে গালি দেয়, কেহ বলে এই শাপে দেশ উৎসন্ন যাইবে, কেহ পাইকদিগকে মিনতি করে, কেহ বা তাহাদের সঙ্গে বিবাদ করে; কিন্তু হরিদাস শান্তভাবে হরিনামে মগ্ন হইয়া সকল আঘাত সহ্য করিলেন। কেবল পাইকেরা যে তাঁহাকে মারিয়া অপরাধী হইতেছে, এই জন্য বড় দুঃখ করিতে লাগিলেন। তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যে, "হে প্রভো! ইহাদের যেন অপরাধ না হয়।" বাইশ বাজারে প্রহার সহ্য করিয়াও হরিদাস বাঁচিয়া রহিলেন। লোকদিগের প্রতিবন্ধকতায় পাইকেরা পুনঃ পুনঃ বাধা প্রাপ্ত হয়, সেই জন্য সবলে তাঁহাকে আঘাত করিতে পারে নাই। শেষে হরিদাস বলিলেন আমি মরিলে যদি তোমাদের মঙ্গল হয় তবে আমি মরি, ইহা বলিয়া এমনি গভীর ধ্যানে মগ্ন হইলেন যে, সকলে বুঝিল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। নবাব আদেশ করিলেন উহাকে গোর দাও। কাজি বলি তাহা হইলে উহার সদগতি হইবে, অতএব উহাকে গঙ্গায় ফেলিয়া দে

যাউক। তাহাই করা হইল। পরে ভাসিতে ভাসিতে হরিদাস তীরে উঠিলেন এবং নবাবকে দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। তখন নবাব কাতর ভাবে মিনতি করিয়া বলিল, আমাকে ক্ষমা করুন, আপনার শত্রু মিত্র সব সমান, যেখানে ইচ্ছা আপনি সেইখানে থাকুন। এই গঙ্গাতীরে গোফার মধ্যে আপনি অবস্থিতি করুন।

অতঃপর হরিদাস উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে করিতে ফুলিয়া গ্রামে চলিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হইল। হরিদাস বলিলেন বিপ্রগণ! ঈশ্বরনিন্দা শ্রবণ করিয়া আমি এই শাস্তি পাইলাম, ইহা আমার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ। এই ফুলিয়া গ্রামে হরিদাসের আশ্রম ছিল। রামায়ণ অনুবাদক কবি কৃত্তিবাসের জন্মভূমি এই স্থান। হরিদাসের উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন শুনিয়া পাষণ্ডগণ তর্জ্জন গর্জ্জন করিত। তাহারা বলিত, এখন মহাবিষ্ণু শয়ানে আছেন, ইহার চীৎকারে যদি নিদ্রাভঙ্গ হয়, তবে আর নিস্তার নাই, হয়ত ইহাদের দোষে দেশে দুর্ভিক্ষ হইবে। যদি ধান্যের মূল্য বৃদ্ধি হয়, তবে ইহাদিগকে প্রহার করিব। হরিনদী গ্রামের এক দুষ্ট ব্রাহ্মণ হরিদাসকে বলিল, "তুমি যে উচ্চ রবে সঙ্কীর্ত্তন কর, ইহা কোন্ শাস্ত্রে আছে?" হরিদাস বলিলেন, "সে কথা আপনারাই ভাল জানেন, আপনাদের মুখেই শুনিয়া যাহা কিছু আমি শিখিয়াছি। যাঁহারা হরিনাম জপ করেন তাঁহাদের নিজেরই পুণ্য, কিন্তু উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন যাহারা শুনে তাহাদেরও পুণ্য হয়। নাম করিতে যাহারা অক্ষম তাহারা উচ্চ কীর্ত্তন শুনিয়া পুণ্যলাভ করে। আপনাকে পোষণ করা আর আপনার সঙ্গে সঙ্গে অন্যকেও পোষণ করা, এতদুভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্‌টি তাহা সহজেই বুঝা যায়।" ব্রাহ্মণ তাহা শুনিয়া রাগিয়া বলিল, "আজ কাল হরিদাস দর্শনকর্ত্তা; বেদপথ দেখিতেছি নষ্ট হইবে। শাস্ত্রে আছে কলিতে শূদ্রে বেদ পড়িবে, তাহা সত্য হইল, যবনেও শাস্ত্রকর্ত্তা হইয়া উঠিল। এইরূপে তুই ভণ্ডামি করিয়া ঘরে ঘরে খাইয়া বেড়াস? তুই যাহা ব্যাখ্যা করিলি যদি ঠিক না হয়, তবে তোর নাক কাটিয়া দিব!" হরিদাস ঈষৎ হাস্য করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিনামকীর্ত্তন করিতে করিতে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

হরিদাসের ব্রত বড় কঠোর ছিল। তিনি প্রতি দিন তিন লক্ষ হরিনাম জপ করিতেন। অতি দ্রুত গতিতে জপ করিলে এক ঘণ্টায় ...

সহস্র হরিনাম জপ করা যায়, তাহা হইলে সমস্ত দিন রাত্রে এক লক্ষ চৌয়াল্লিশ হাজার হইতে পারে। শৌচ আচমন স্নান আহার নিদ্রা চারি ঘণ্টার কমে আর হয় না, এক লক্ষ কিংবা দুই লক্ষ হরি নামের অধিক কিরূপে তিনি জপ করিতেন বুঝা যায় না। যাহউক, তিনি সর্ব্বদা চিত্তকে নির্ম্মল রাখিবার জন্য অতি চমৎকার উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। হরিদাসের প্রতি অনেকের শ্রদ্ধা ভক্তি দেখিয়া রামচন্দ্র খাঁ নামক নিকটস্থ কোন জমিদার তাঁহাকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিবার মানসে এক বেশ্যাকে কুমন্ত্রণা দিয়া নিকটে পাঠাইয়া দেয়। তিনি হরিনামের বিস্তীর্ণ ঘন জালে দিবা রাত্রি ২৪ ঘণ্টা কাল একবারে এমন করিয়া ঘেরিয়া রাখিয়াছিলেন যে তাহার মধ্যে একটু মাত্র ছিদ্র ছিল কি না সন্দেহ। বেশ্যা তাঁহার তপস্যাকুটীরের দ্বারে গিয়া মনোভিলাষ জ্ঞাপন করাতে হরিদাস বলিলেন, "আমার জপ সাঙ্গ হউক, তাহার পর তোমার কথা শুনিব।" ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল, তথাপি জপ আর সাঙ্গ হয় না; অগত্যা সে কুলটা মায়াবিনী গৃহে ফিরিয়া গেল। পর দিন সন্ধ্যাকালে আবার আসিয়া সে জপ সাঙ্গ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল; এবং কপটভাবে নিজেও দুই একবার জপ করিতে আরম্ভ করিল। সে দিন হরিদাস তাহাকে বলিলেন, "কল্য তুমি বড় কষ্ট পাইয়াছ, ভাল অদ্য অপেক্ষা করিয়া থাক তোমার আশা পূর্ণ হইতে পারে।" ক্রমাগত সমস্ত রাত্রি হরিদাসের পবিত্র হরিমন্দিরের দ্বারদেশে অবস্থিতি করিয়া এবং কৃত্রিম ভক্তির সহিত আপনি দুই একবার সেই নাম রসনায় গ্রহণ করিয়া তাহার বিকৃত কঠিন হৃদয় অল্পে অল্পে নরম হইয়া আসিল। অগ্নির নিকট থাকিলে কি আর মন উত্তপ্ত না হইয়া যায়? সে দিনেও জপ সাঙ্গ হইল না। বেশ্যা নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায়, এমন সময় হরিদাস তাহাকে বলিলেন, "দেখ, আমি এক মাসে এক কোটি নাম জপের ব্রত লইয়াছি, কল্য অবশ্যই শেষ হইবে, অতএব তুমি আগামী কল্য আসিও।" তৃতীয় দিনেও সে নারী কুটীরদ্বারে বসিয়া পূর্ব্ববৎ কপটভাবে নাম জপ করত সময় প্রতীক্ষা করিয়াছিল। পরিশেষে চতুর্থ দিবসের প্রাতঃকালে দেখে যে সঙ্গগুণে তাহার মন গলিয়া গিয়াছে, হরিনামের জালে সে বাঁধা পড়িয়াছে; প্রভাত হইল তথাপি আর গৃহে গমন করিতে পারে না। তখন আপনার পাপ স্মরণ করিয়া, বৈরাগীর চরণে পড়িয়া সে নারী

কাঁদিতে লাগিল। হরিদাস বলিলেন "দেখ, তোমার দুরভিসন্ধি বুঝিয়া তখনি আমি এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতাম, কেবল তোমাকে হরিনাম লওয়াইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম, এক্ষণে তুমি যদি আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাও তবে সমস্ত ধন ব্রাহ্মণ দরিদ্রকে দিয়া এই কুটীরে আসিয়া পতিতপাবন হরিনাম সাধন কর।" এই কথা বলিয়া হরিদাস তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, বেশ্যা সর্ব্বস্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক মস্তক মুণ্ডন করিয়া একবস্ত্রা হইয়া সেইখানে হরিনাম সাধনে নিযুক্ত রহিল। পরে নিতাই যখন বঙ্গদেশে হরিনাম প্রচার করিয়া বেড়ান, ঐ সাধুবিদ্বেষী দুরাত্মা রামচন্দ্রের চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া তিনি উপনীত হন। বহু লোক জন তাঁহার সঙ্গে দেখিয়া সে বলিয়া পাঠাইল যে গোসাঞীকে কোন গৃহস্থের প্রশস্ত গোশালায় যাইতে বল, এখানে স্থান সঙ্কীর্ণ, এত লোক ধরিবে না। নিতাই রুষ্ট হইয়া সে স্থান ত্যাগ করিলেন। তিনি যেখানে বসিয়াছিলেন পাষণ্ড রামচন্দ্র তথাকার কতক মাটি উঠাইয়া সেখানে গোময় লেপন করিতে আদেশ করিল। এ ব্যক্তি নবাবকেও কর দিত না, নিজে সব ফাঁকি দিয়া ভোগ করিত। কিছু দিন পরে রাজসরকারের লোক আসিয়া ইহার গ্রাম ও বাড়ী লুট করে, জাতি ধর্ম্ম খায়, এবং সপরিবারে সকলকে বাঁধিয়া লইয়া যায়।

এখান হইতে হরিদাস সপ্তগ্রামের মধ্যবর্ত্তী চান্দ্রপুরে (বোধ হয় বর্ত্তমান চন্দনপুর) গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে তৎপ্রদেশীয় মজুমদার হিরণ্য দাস ও গোবর্দ্ধন দাসের গৃহে পণ্ডিতদিগের এক সভা হয়, তথায় হরিদাস হরিনামের মহিমা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলিলেন, "যেমন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সমস্ত অন্ধকার, দস্যু চোর নিশাচরগণ পলায়ন করে এবং যাবতীয় বস্তু প্রকাশিত হয়, তেমনি হরিনাম সাধন দ্বারা অজ্ঞানতা পাপান্ধকার দূরে প্রস্থান করে এবং হরিপদে প্রেমোদয় হয়।" সভাস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ হরিদাসের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিলেন। গোপাল চক্রবর্ত্তী নামক এক অভদ্র ব্রাহ্মণ গৌড়েশ্বরের অধীনে আরিন্দাগিরি কার্য্য করিত, সে নামমাহাত্ম্য শ্রবণে ক্রোধান্ধ হইয়া বলিল, "যদি নামে মুক্তি না হয়, তবে এই পণ রাখ তোমার নাক কাটিয়া লইব!" হরিদাস বলিলেন, "অবশ্য আমি তাহাতে সম্মত আছি।" শেষ মহা গণ্ডগোল উঠিল, গোপালকে আর সকলে ভৎর্সনা করিয়া হরিদাসকে মিনতি করিতে

এক জন প্রাচীন বৈষ্ণব সাধুর শিষ্য। মাধবেন্দ্রপুরী অদ্বৈতেরও পূর্ব্বে ভক্তিপথ প্রদর্শন করিয়া যান। তিনি নিঃসঙ্গ বৈরাগী হইয়া বৃন্দাবনেই প্রায় বাস করিতেন, এবং এক জন অতি প্রমত্ত ভাবুক বৈষ্ণব ছিলেন। গয়ার দেবমন্দির, পর্ব্বতরাজি, তীর্থযাত্রীদিগের ধর্ম্মোৎসাহ এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শনে গৌরের হৃদয় বিগলিত হয়, পরে ঈশ্বরপুরীকে দেখিয়া এবং তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া তাঁহার চিত্ত একবারে ভাবে প্রেমে আকুল হইয়া উঠে। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আপনি পরমতীর্থ, আমাকে সংসারসমুদ্র হইতে উদ্ধার করুন, এই আমি আপনাকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিলাম, আমাকে কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃতরস পান করান।" ঈশ্বরপুরী এ সকল কথা শুনিয়া এবং ব্যাকুলতা দেখিয়া মোহিত হইলেন। এই রূপ কথাবার্ত্তার পর গৌরাঙ্গ বিষ্ণুপাদপদ্ম পূজা করিয়া বাসায় আসেন। পরে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া আহারে বসিবেন এমন সময় ব্রহ্মচারী তথায় উপস্থিত হইলেন। গৌর সেই অন্ন তাঁহাকে ভোজন করাইয়া নানাবিধ গন্ধমাল্য দ্বারা তাঁহার শুশ্রূষা করত পুনর্ব্বার রন্ধন করিলেন। আর এক দিন শচীকুমার পুরীকে বলিলেন, "আমাকে আপনি মন্ত্র দিয়া দীক্ষিত করুন।" তিনি বলিলেন, "তোমাকে প্রাণ দিতে পারি, মন্ত্র দেওয়া অধিক কি! নবদ্বীপধামে যে দিন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে সেই অবধি আমার চিত্ত তোমাতে নিবদ্ধ হইয়া আছে। তখন গৌর রীতিমত দশাক্ষর মন্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক গুরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া কহিলেন, "আমি আপনাকে আত্মসমর্পণ করিলাম, আমার প্রতি শুভ দৃষ্টি করুন, আমি যেন সর্ব্বদা কৃষ্ণপ্রেমসাগরে ভাসিতে থাকি।" তদনন্তর ঈশ্বরপুরী তাঁহাকে বক্ষে ধারণপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন, উভয়ের প্রেমজলে উভয়ের অঙ্গ অভিষিক্ত হইল। মন্ত্রগ্রহণের পর চৈতন্য গয়ায় কিছু দিন অবস্থিতি করেন। কেহ কেহ বলেন, এই খানে নিত্যানন্দ অবধূতের সঙ্গে তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। এক দিন গৌরাঙ্গ ইষ্টমন্ত্র ধ্যান করিতে করিতে ভাবে বিহ্বল হইয়া, "কৃষ্ণ রে, বাপ রে, প্রাণ, জীবন, শ্রীহরি, আমার প্রাণ চুরি করিয়া তুমি কোথায় চলিয়া গেলে! আমার ঈশ্বরকে আমি পাইলাম, আমাকে ছাড়িয়া তিনি কোথায় গমন করিলেন!" এই কথা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। ভক্তিরসে মগ্ন হইয়া ধূলিধূষরিত অঙ্গে মহা আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। সঙ্গিগণকে বলিলেন, "তোমরা গৃহে চলিয়া যাও, আমি আর সংসারে প্রবেশ করিব না।

যেখানে আমার প্রাণনাথকে পাইব সেইখানে আমি যাইব।” শিষ্যগণ অনেক প্রবোধ দিতে লাগিলেন, কিন্তু সে ব্যাকুলতা ঔদাস্য কি সামান্য উপদেশে নিবৃত্ত হয়? নিরন্তর ভাবরসে তাঁহার হৃদয় অস্থির হইয়া রহিল। এক দিন শেষ রাত্রে উঠিয়া অত্যন্ত উদ্বেগের সহিত “কৃষ্ণ রে, বাপ রে, তুমি কোথায় আছ!” এইরূপ বলিতে বলিতে তিনি মথুরার দিকে চলিয়া গিয়াছিলেন। কিছু দূর গমনের পর দৈববাণী হইল, “তোমার গমনের এ সময় নয়, যখন যাইবার সময় উপস্থিত হইবে তখন গমন করিও। এখন নিজগৃহে প্রত্যাগমন কর, তুমি লোকনিস্তারের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছ, ব্রহ্মাণ্ডময় কীর্ত্তন করিবে, জগতে প্রেমভক্তি বিতরণ করিবে।” এই দৈববাণী শুনিয়া আর তিনি যাইতে পারিলেন না, শিষ্যদিগকে লইয়া পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। এ প্রকার মহাপুরুষদিগকে ভগবান্ স্বয়ং উপদেশ দিয়া পরিচালিত করেন, ভক্তের হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া তিনি অলৌকিক ভাষায় ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা দেন এ কথা চিরকাল সকল দেশে প্রসিদ্ধ আছে। বাড়ী ফিরিয়া আসিবার কালে কানাইয়ের নাট্যশালা নামক গ্রামে তাঁহার ঈশ্বরদর্শন লাভ হয়, এবং তাহাতে প্রাণ মন একবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

তীর্থভ্রমণ, মন্ত্রগ্রহণ এবং সাধুসহবাস দ্বারা গৌরাঙ্গের যে ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল তাহা যিনি দেখিলেন তিনিই বুঝিতে পারিলেন। বস্তুতঃ ঈশ্বরপুরীর পবিত্র সহবাসে তাঁহার ভক্তিপূর্ণ হৃদয়দ্বার একবারে চিরদিনের জন্য উন্মুক্ত হইয়া যায়। যখন তিনি দেশে ফিরিয়া আসিলেন তখন বোধ হইল যেন সে মানুষই নয়; মুখশ্রী, কথাবার্ত্তা, ব্যবহার, চক্ষের দৃষ্টি আর এক প্রকার হইয়া গিয়াছে। পথভ্রমণে দেহলাবণ্য জ্যোতিহীন, বস্ত্র মলিন, মস্তকের কেশ রুক্ষ, মন যেন আর এক রাজ্যে বিচরণ করিতেছে, বিরহ ব্যাকুলতার চিহ্ন মুখমণ্ডলে জাজ্বল্যমান প্রকাশ পাইতেছে; মানসিক ভাবে এবং বাহ্য আকৃতিতে স্পষ্ট অনুভূত হইল অন্তরে বৈরাগ্যের অগ্নি প্রধূমিত হইয়া উঠিয়াছে। পুত্রবৎসলা শচীদেবী সন্তানকে পাইয়া আহ্লাদিত হইলেন। প্রতিবাসী বন্ধু বান্ধব সকলে তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। গৌরাঙ্গ যথাযোগ্য প্রতি জনকে প্রণাম সম্ভাষণ করিলেন। সুহৃদ্বর্গ সকলকে লইয়া গৌরচন্দ্র তীর্থের গল্প করিতে লাগিলেন। এ সময়ে গৌরের বয়ঃক্রম অনুমান বাইশ বৎসর হইবে।

ভক্তির নবানুরাগ।

সমাগত প্রতিবাসী বন্ধু বান্ধবেরা বিদায় হইলে গৌরচন্দ্র বিষ্ণুভক্ত কতিপয় সাধুর সঙ্গে গোপনে তত্ত্বালাপ করিতে বসিলেন। গয়াধামে কোথায় কি দেখিয়াছিলেন এবং তথায় গিয়া মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল তাহার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। এই সব কথা বলিতে বলিতে তাঁহার নয়নযুগলে অজস্র বারিধারা বহিতে লাগিল। যেমন আগ্নেয় গিরির গর্ভস্থ দ্রব ধাতুরাশি অন্তস্তল বিদীর্ণ করিয়া চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, তেমনি ক্রমশঃ সেই নবোদিত ভক্তির উচ্ছ্বাস তাঁহার শরীরকে রোমাঞ্চিত কম্পিত অস্থির করিয়া বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়িল। বৈষ্ণবদিগের সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে তিনি ভাবে একেবারে বিহ্বল হইলেন, নয়নজলে সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গেল, শেষ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শ্রীমান্ পণ্ডিতাদি ভক্তগণ চৈতন্যের ব্যাকুলতা অনুরাগ দর্শনে বিস্মিত হইয়া পরস্পরে বলাবলি করিতে লাগিলেন, এত অসামান্য ভক্তির লক্ষণ দেখিতেছি! এমন অপূর্ব্ব ভাব কখনত দেখি নাই! বোধ হয় ইহাঁর প্রতি ভগবানের কৃপা হইয়াছে। ক্ষণকাল পরে গৌরমণি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া উঠিয়া বসিলেন; এবং কাতর ভাবে সকলকে বলিলেন, "বন্ধুগণ! অদ্য তোমরা গৃহে প্রত্যাগমন কর; আমার দুঃখের কথা সমস্ত আমি তোমাদিগকে বলিব, কল্য শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে তোমরা আসিবে।" এই বলিয়া সকলকে বিদায় দিয়া তিনি একাকী প্রেমাবেশে বিভোর হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার ঔদাস্য ভাব দর্শনে শচীমাতার মনে ভয় ও বিস্ময়ের সঞ্চার হইল। তথাপি বহু দিন পরে সন্তানকে পাইয়া তাঁহার হৃদয় শান্তি লাভ করিয়াছিল। ক্ষণকাল পরে আবার গৌরচন্দ্র "কোথায় কৃষ্ণ! কোথায় কৃষ্ণ!" বলিয়া চীৎকার রবে গান ধরিলেন, তাহা শুনিয়া অন্যান্য ভক্তগণ দৌড়িয়া নিকটে আসিল। শচীমাতার মনে শঙ্কা হইল, সন্তানের বুঝি কোন উৎকট রোগ উপস্থিত হইয়াছে; এই মনে করিয়া তিনি ঠাকুর দেবতাকে স্মরণ করিতে লাগিলেন।

শ্রীবাস পণ্ডিতের পুষ্পোদ্যানে এক ঝাড় কুন্দ ফুলের গাছ ছিল,

প্রতিদিন প্রাতে প্রাচীন বৈষ্ণবগণ তথায় ফুল তুলিবার উপলক্ষে একত্রিত হইয়া নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতেন। গদাধর, গোপীনাথ, রামাই, শ্রীবাস ভক্তিরসে মগ্ন হইয়া পুষ্পচয়ন করিতেছেন, এমন সময় শ্রীমান্ পণ্ডিত হাসিতে হাসিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলে বলিলেন, "কি হে! আজ যে বড় হাসির ঘটা দেখিতেছি?" শ্রীমান বলিলেন, "বড় অদ্ভুত কথা, অসম্ভব ব্যাপার! নিমাই পণ্ডিত গত কল্য গয়া হইতে বাড়ী আসিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম, দেখিলাম তাঁহার আর সে পূর্ব্বের ভাব নাই, বৈরাগ্য এবং ভক্তির লক্ষণ সকল তাঁহাতে দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়াছি। আমাদিগকে নিভৃতে ডাকিয়া তীর্থের কথা বলিতে বলিতে যাই পাদপদ্ম তীর্থের কথা পড়িল, অমনি তিনি কাঁদিয়া আকুল হইলেন, একবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অদ্য সদাশিব, মুরারি, গদাধর এবং আমাকে শুক্লাম্বরের ঘরে যাইতে বলিয়াছেন, তথায় তিনি আপনার মনের দুঃখ সকল প্রকাশ করিবেন।" এই কথা শুনিয়া সকলে হরিবোল দিয়া উঠিলেন। শ্রীবাস বলিলেন, "কৃষ্ণ আমাদের গোত্র বৃদ্ধি করুন!" সমস্ত ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে এই আনন্দের সংবাদ প্রচার হইয়া পড়িল। আহ্লাদের সীমা নাই। প্রখর তার্কিক মহাবুদ্ধিমান্ নিমাই পণ্ডিত ভক্তিরসে মত্ত হইয়াছেন, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পক্ষে তখন ইহার তুল্য সুখের সংবাদ আর কি হইতে পারে? ভক্তপরিবার বৃদ্ধি হইল দেখিয়া তাঁহারা সকলে হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

যথাসময়ে শুক্লাম্বরের গৃহে ভক্তবৃন্দের সমাগম হইল, গৌরচন্দ্র তথায় আসিয়া মিলিলেন। ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় তখন বিশ্বম্ভরের অবস্থা। কথাবার্ত্তা বিশেষ কিছু আর হইল না, সকলকে দেখিবামাত্র তাঁহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গেল। "যে ঈশ্বরকে আমি পাইলাম, তিনি কোথায় গেলেন! এই বলিয়া ঘরের একটা থাম এমনি ভাবে জড়াইয়া ধরিলেন, যে সেটা ভাঙ্গিয়া পড়িল। সেই সঙ্গে সঙ্গে গৌরাঙ্গ মুক্তকেশে ভূতলশায়ী হইলেন। চারি দিকে ক্রন্দনের মহা রোল উঠিল, ভক্তগণ তাঁহাকে ঘেরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অধোমুখে গদাধর কাঁদিতেছেন, অপর সকলে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় অবাক্ হইয়া গৌররূপ দেখিতেছে, আহা সে কি এক আশ্চর্য্য দৃশ্য! ধরাতলে ইহার অনুরূপ আর কিছুই দেখা যায় না। কিয়ৎকাল পরে চেতনা লাভ করিয়া বিশ্বম্ভর বলিলেন, "গদাধর! তুমি ভাগ্যবান্ সুকৃতি

পুরুষ, বালক কাল হইতে প্রভুর চরণে তোমার ভক্তি, হায় আমার জন্ম বৃথা গেল! অমূল্য নিধি পাইয়াও আমি নিজদোষে তাহা হারাইলাম!” এই কথা বলিয়া তিনি ভূমিতলে লুটাইতে লাগিলেন। একবার জ্ঞান হয় আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন; আঘাত প্রতিঘাতে অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত এবং আপাদ মস্তক ধূলিধুষরিত হইল; চক্ষু আর উন্মীলন করিতে পারেন না, কেবল মুখে হরি হরি বলেন আর বন্ধুগণের গলা ধরিয়া কাঁদেন। এইরূপ প্রেমাবেশে সমস্ত দিন চলিয়া গেল। অনন্তর এই কথা ভক্তেরা আর আর সকলের নিকট প্রচার করিতে লাগিলেন। কেহ বলেন ভালই হইল, এখন পাষণ্ডীদিগকে আর ভয় নাই। কেহ বলেন, স্বয়ং কৃষ্ণ আসিয়া গৌরের শরীরকে আশ্রয় করিয়াছেন। তাঁহারা নিমাইকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যে সমস্ত নবদ্বীপের লোক এ সংবাদ জানিতে পারিল। ইহা লইয়া নগরমধ্যে একটি ভয়ানক আন্দোলন উপস্থিত হয়। ঈশ্বরবিরহে মনুষ্য এমন করিয়া কাঁদে, মাটীতে গড়াগড়ি দেয়, মূর্চ্ছিত হইয়া মৃতবৎ পড়িয়া থাকে, শোক করে, ইহাত পূর্ব্বে কেহ কখন চক্ষে দেখে নাই; সুতরাং ইহা একটি নূতন ব্যাপার হইয়াছিল। বিশেষতঃ মহাবুদ্ধিমান্, জ্ঞানগর্ব্বিত, গম্ভীর প্রকৃতি গৌরাঙ্গ এ প্রকার উন্মাদবৎ ব্যবহার করিবেন, হরিবিরহে ব্যাকুল হইয়া কাঁদিবেন, ইহা আশার অতীত; এই জন্য প্রতি ঘরে ঘরে এই কথা হইতে লাগিল।

চৈতন্য গৃহে গিয়া ক্ষণকাল উন্মনা হইয়া রহিলেন। তদনন্তর গঙ্গাদাস পণ্ডিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। পণ্ডিত বলিলেন, “বৎস! তুমি পিতৃকুল উদ্ধার করিলে, তোমার জীবন ধন্য! কিন্তু যে হইতে তুমি গয়ায় গিয়াছ, তোমার ছাত্রগণ কেহ আর পুঁথি খোলে নাই; অতএব কল্য হইতে তুমি পুনরায় অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হও।” তিনি যে আজ্ঞা বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া গৃহে আসিলেন, এবং পর দিন শ্রীমুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে ছাত্র পড়াইতে বসিলেন। সে দিন পড়া শুনা আর কিছুই হইল না, সঞ্জয়কে কোলে লইয়া কেবল নয়নজলে তাঁহার অঙ্গ অভিষিক্ত করিয়া দিলেন। ভাবে প্রেমে বিভোর, পড়াইবার শক্তি তখন কোথায়? গৃহে অবস্থানকালে গৌরাঙ্গ কেবল ভাগবতের শ্লোক পড়েন, আর প্রেমজলে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ভাসিয়া যায়। নিরন্তর এইরূপ রোদন, বিরহবিলাপ, উন্মাদের ন্যায় ব্যবহার দেখিয়া শচীর মনে আশঙ্কা দিন দিন

বাড়িতে লাগিল। পুত্রের কল্যাণের জন্য তিনি কখন ঠাকুর দেবতার পূজা দেন, দৈবক্রিয়া করেন, কখন পুত্রবধূকে নিকটে আনিয়া বসান, এবং বিশ্বম্ভরের সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু পুত্রের আর অন্য কোন দিকে দৃষ্টি নাই, যুবতী ভার্য্যার মুখপানে একবার ফিরিয়াও চাহেন না। "কোথা কৃষ্ণ! কোথা দীনবন্ধু!" বলিয়া এক একবার এমনি হুঙ্কার গর্জ্জন করিয়া উঠেন যে তাহা শুনিয়া মাতার মনে ভয়ের সঞ্চার হয়, বিষ্ণুপ্রিয়া দূরে পলায়ন করেন। রজনীতে গৌরের চক্ষে নিদ্রা নাই, সর্ব্বদা অস্থির, যেন কোন এক অদ্ভুত শক্তি দ্বারা দিবা নিশি তিনি চালিত হইতে লাগিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার নিজের উপর তখন আর বড় কর্তৃত্ব ছিল না। তোমার আমার ধর্ম্মভাব আয়ত্তাধীন, চাই উপাসনা ধ্যান যোগ সঙ্কীর্ত্তন দশ দিন করিলাম, চাই দশ বৎসর নাও করিতে পারি; কিন্তু ইঁহার অন্য প্রকার ভাব, ধর্ম্ম ইঁহাকে ধরিয়াছিল। একে ভক্তি তাহাতে নবোদ্যম, মত্ততার আর বিরাম রহিল না।

অধ্যাপনা সমাপ্তি।

পর দিন প্রাতে গঙ্গাস্নান করিয়া নিমাই পণ্ডিত ছাত্র পড়াইতে বসিলেন। সে দিকেত আর মন নাই, অন্যের উপরোধে অনুরোধে এক বার কেবল গিয়া বসিলেন মাত্র। ছাত্রেরা যাই হরি বলিয়া পুঁথি খুলিতে লাগিল, অমনি সেই নাম শ্রবণমাত্র গৌরচন্দ্র ভক্তিরসে প্রমত্ত হইয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন। কিছু ক্ষণ পরে ভাবে মগ্ন হইয়া পড়াইতে লাগিলেন। যাহা পড়ান তাহাতেই হরিনাম ব্যাখ্যা করেন। সূত্র বৃত্তি টীকা সব হরিনাম। নিমাই বলিতে লাগিলেন, "সর্ব্ব শাস্ত্রের মর্ম্ম একমাত্র হরি। অজ ভব আদি সকলে তাঁহার কিঙ্কর। হরিই সর্ব্বময়কর্ত্তা, তাঁহাকে ছাড়িয়া যাহারা অন্যরূপে শাস্ত্রব্যাখ্যা করে তাহাদের জন্মই বৃথা। হরিচরণে যাহাদের মতি গতি নাই, তাহাদের বিদ্যাশিক্ষা কেবল দুর্গতি মাত্র। হরিভক্তিহীন শাস্ত্রকারেরা গর্দ্দভের ন্যায় কেবল পুস্তকরাশি বহন করে। পড়িয়া শুনিয়া অহঙ্কারী হইয়া লোক সকল উৎসন্ন দশা প্রাপ্ত হইল। হরিপদে রতি না থাকিলে পণ্ডিত কখন শাস্ত্রমর্ম্ম বুঝিতে পারে না। কিন্তু ভক্তিমান্ দরিদ্র অধম ব্যক্তি অনায়াসে সেই প্রভুর চরণ লাভ করে। অতএব ভাই সকল! আমার কথা শুন, যে চরণ শঙ্করাদি দেবগণ ভজনা করিয়াছেন, তোমরাও সেই অমূল্য চরণ ভজনা কর। এই নবদ্বীপে কাহার এমন ক্ষমতা আছে যে আমার এই ব্যাখ্যান সে খণ্ডন করিতে পারে?"

ছাত্রগণ নূতনবিধ ব্যাখ্যা শুনিয়া এবং অধ্যাপকের ভাব ভঙ্গী দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিল। ক্ষণকাল পরে সংজ্ঞা পাইয়া কিঞ্চিৎ লজ্জিতভাবে চৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "অদ্য যেরূপ পাঠ দিলাম, তাহা কি তোমরা বুঝিতে পারিলে?" ছাত্রগণ বলিল, "মহাশয়! আপনি সকল বিষয়েই কৃষ্ণনাম ব্যাখ্যা করিলেন, ইহা কি আমরা বুঝিতে পারি?" তখন হাসিয়া গৌরাঙ্গ বলিলেন, "চল, আজ বেলা হইয়াছে, পুঁথি বাঁধিয়া চল গঙ্গাস্নানে যাই।" পরে স্নান করিয়া পূজান্তে আহারে বসিলে শচী জিজ্ঞাসা করিলেন "বাপ নিমাই! আজ তুমি কি পুথি পাঠ করিলে, এবং কাহার সঙ্গে কন্দল করিলে?" কন্দল অর্থে এখানে বিচার। গৌর বলিলেন, "মা, আজ

কেবল কৃষ্ণ নামের মাহাত্ম্য পড়িলাম। তাঁহার নাম শ্রবণ কীর্ত্তন এবং তাঁহার চরণকমলই সার; এবং তাহাই সার শাস্ত্র যাহাতে কৃষ্ণভক্তি আছে। "যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্ন দৃশ্যতে। ন শ্রোতব্যং ন বক্তব্যং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ॥" অতএব জননি! আপনি সর্ব্বদা হরিনাম করুন, হরিপদে ভক্তি হইলে মায়ার বন্ধন ঘুচিয়া যাইবে।" এইরূপে তিনি শয়নে ভোজনে উপবেশনে সর্ব্বদা কেবল হরিভক্তি আলোচনা করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পূর্ব্বে যেমন বিদ্যাচর্চ্চা শাস্ত্রালাপে দিন রাত্রি মগ্ন থাকিতেন, এখন তেমনি ভগবৎপ্রসঙ্গে একবারে ডুবিয়া রহিলেন, হরিকথা ভিন্ন আর কোন কথা নাই। বিশ্বম্ভর যখন যাহাতে মন দিতেন তখন তাহাই লইয়া থাকিতেন, ইহা তাঁহার একটি বিশেষ লক্ষণ ছিল।

পর দিন প্রাতে ছাত্রগণ পুনরায় অধ্যয়ন করিতে আসিল। চৈতন্য পড়াইতে বসিলেন, কিন্তু মুখে কৃষ্ণ কথা ভিন্ন আর কিছু আসে না। ছাত্রেরা বলিল, সিদ্ধ বর্ণ কাহাকে বলে? তিনি উত্তর দিলেন, সর্ব্ব বর্ণে সিদ্ধ নারায়ণ। বর্ণসিদ্ধি কিরূপে হইল? কেন কৃষ্ণের কৃপায়! ছাত্রগণ বলিল, হে পণ্ডিত! উচিতমত ব্যাখ্যা কর। চৈতন্য বলিলেন সর্ব্বদা কৃষ্ণ নাম স্মরণ কর, আদি মধ্য অন্তে শ্রীকৃষ্ণ ভজনা কর। ব্যাখ্যান শুনিয়া শিষ্যেরা হাসিতে লাগিল। কেহ বলে পণ্ডিতের বায়ুরোগ জন্মিয়াছে, কেহ অন্য প্রকার। ছাত্রেরা পুনরায় বলিল, আপনি এ কিরূপ ব্যাখ্যা করিলেন? চৈতন্য বলিলেন, শাস্ত্রে যেরূপ আছে তাহাই ব্যাখ্যা করিয়াছি। এখন যদি তোমরা বুঝিতে না পার, তবে বৈকালে আসিও, আমি ভাল করিয়া পড়াইব; আমিও নির্জ্জনে বসিয়া একবার গ্রন্থ আলোচনা করিয়া দেখি। শিষ্যগণ ঘরে চলিয়া গেল।

নিমাই পণ্ডিতের এই সকল কথা গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট জানাইয়া ছাত্রেরা অভিযোগ করিল। তাহারা বলিল, "মহাশয়! নিমাই পণ্ডিত গয়া হইতে আসিয়া অবধি এইরূপ আরম্ভ করিয়াছেন, এখন আমরা কি করি উপায় বলিয়া দিন।" গঙ্গাদাস তাহাদিগকে বুঝাইলেন যে, "তোমরা এখন যাও, আমি এ বিষয়ে নিমাইকে সৎপরামর্শ দিব।" অনন্তর বৈকালে চৈতন্য-দেব সশিষ্য গঙ্গাদাসের ভবনে উপস্থিত হইলেন। গঙ্গাদাস বলিলেন "বৎস নিমাই, ব্রাহ্মণের অধ্যাপনকার্য্য অল্প ভাগ্যে হয় না, তবে কেন তুমি ইহাতে অবহেলা করিতেছ? দেখ, তোমার পিতা এবং মাতামহ পণ্ডিত ছিলেন,

অধ্যাপনা ত্যাগ করিলে যদি ভক্তি হয় তবে কি তাঁহারা ভক্ত ছিলেন না ? যে ব্রাহ্মণ উত্তমরূপে অধ্যয়ন করে সেই বৈষ্ণব ; মূর্খ ব্রাহ্মণ যে, সে ভাল মন্দ কিরূপে বুঝিবে ? অতএব মনোযোগ পূর্ব্বক ছাত্রদিগকে শিক্ষা দাও।” চৈতন্য বলিলেন, “ আপনার চরণপ্রসাদে যাহা শিখিয়াছি তাহাতে এমন কে আছে যে আমার ব্যাখ্যা খণ্ডন করিবে ? আমি ছাত্র পড়াইব, যদি কাহারো ক্ষমতা থাকে তাহা খণ্ডন করুক !” তদনন্তর তিনি গর্ব্বের সহিত ছাত্রদিগকে পড়াইতে আরম্ভ করিলেন।

রত্নগর্ভ আচার্য্য নামক একজন প্রতিবেসী ভক্তিযোগে অতি সুস্বরে ভাগবত গ্রন্থ পাঠ করিতেন। এক দিন অধ্যয়নকালে হঠাৎ সেই শব্দ চৈতন্যের কর্ণে যাইয়া প্রবেশ করিল, অমনি তিনি ভাবে বিমুগ্ধ হইয়া ভূমিতে লুটাইতে লাগিলেন। অঙ্গে অশ্রু কম্প পুলকাদি ভাবের আবির্ভাব হইল। কত ক্ষণ পরে উঠিয়া তিনি সেই ব্রাহ্মণকে গাঢ় আলিঙ্গন দান করিলেন, এবং ছাত্রদিগকে বলিলেন, আমি কি আজ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলাম ? তাহারা বলিল আমরা দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। আপনার মহিমা আমরা কি বুঝিব ?

তৎপর দিন প্রাতে ছাত্রেরা নিবেদন করিল, “ আমাদিগকে অদ্য ধাতুর সংজ্ঞা বুঝাইয়া দিন।” চৈতন্য বলিলেন, “ হরির শক্তি ভিন্ন ধাতু আর কিছুই নয়। ধাতুসূত্রের ব্যাখ্যা করিতেছি সকলে শ্রবণ কর। দেখি কাহার ক্ষমতা কত দূর, কে আমার ব্যাখ্যা খণ্ডন করিতে পারে? রাজাই বল, আর প্রজাই বল ; পুষ্প চন্দন বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত আমোদপ্রিয় সুন্দর পুরুষই হউক, কিংবা প্রবল পরাক্রান্ত বীর পুরুষই হউন ; ধাতু গেলে সকলেরই দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়। তখন কোথায় বা বল বিক্রম, আর কোথায় বা শোভা সৌন্দর্য্য ; ধাতু না থাকিলে কিছুই থাকে না। শরীর হইতে ধাতু চলিয়া গেলে কেহ তাহাকে দগ্ধ করে, কেহ বা পুঁতিয়া ফেলে। হরির শক্তিকেই ধাতু বলি ; যত ক্ষণ তাঁহার শক্তি শরীরে থাকে তত ক্ষণ জীবন। লোকে সেই শক্তিকেই স্নেহ মমতা, ভক্তি শ্রদ্ধা করে, বিদ্যার অহঙ্কারে পণ্ডিতেরা ইহা বুঝিতে পারে না। ভাল না হয় সকলে ভাবিয়া দেখ। এখন যাহাকে মান্য গণ্য করিতেছি, ধাতু গেলে তাহাকে অস্পৃশ্য বলিয়া ঘৃণা করিব। পিতা পুত্রকে কোলে লইয়া আদর করেন, ধাতু না থাকিলে আবার তিনিই তাহার মুখে অগ্নি দিয়া দগ্ধ করিয়া ফেলেন।

অতএব হরির শক্তিই ধাতু। এ কথা যদি কেহ খণ্ডন করিতে পারে তবে করুক! যে কৃষ্ণের শক্তি এমন পবিত্র এবং পূজ্য, ভাই সকল! তাঁহাকে তোমরা ভক্তি কর; তাঁহার নাম শ্রবণ কীর্ত্তন কর,এবং তাঁহার শ্রীচরণ ধ্যান কর। তাঁহার মহিমার অন্ত নাই, দন্তে তৃণ লইয়া সেই প্রভুর পদসেবা কর। হরি মাতা, হরি পিতা, হরি প্রাণ ধন; তোমাদের পায়ে ধরিয়া বলি, তাঁহাকে তোমরা আত্ম সমর্পণ কর।"

ছাত্রেরা ব্যাখ্যা শুনিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, কেহ আর কিছু দ্বিরুক্তি করিতে পারিল না। মত্ততার কিঞ্চিৎ অবসান হইলে চৈতন্য সলজ্জ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধাতুসূত্রের আজ কিরূপ ব্যাখ্যা করিলাম?" ছাত্রেরা বলিল, "প্রকৃত অর্থই আপনি বলিয়াছেন, কার বাপের সাধ্য যে এ কথা খণ্ডন করে?" পরে চৈতন্য সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা তোমরা সত্য করিয়া বল দেখি, আমার কি কোন বায়ুর পীড়া হইয়াছে? আমি কি ব্যাখ্যা করিতে কি বলিয়া ফেলি কিছুরই স্থিরতা নাই।" শিষ্যেরা কহিল "সূত্র, বৃত্তি, টীকা এ সমস্তের মধ্যে আপনি এক হরিনাম ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এ সব কথা বুঝিতে পারে এমন কে আছে? হরিনামে আপনার যেরূপ ভক্তির উদয় হয় তাহাতে আর আপনাকে মানুষ বলিয়াত বোধ হয় না? আপনার শরীরে অশ্রু কম্প পুলক যেরূপ দেখিলাম এমন আর কোথাও আমরা দেখি নাই। কল্য ভাগবতপ্রদীপে আপনি যখন মূর্চ্ছিত হইলেন, তখন আপনার শরীরে ধাতু ছিল না; বোধ হইতে লাগিল যেন আপনার চক্ষে গঙ্গা নদী আবির্ভূত হইয়াছেন। শেষে যেরূপ কম্প উপস্থিত হইল তাহা এক অদ্ভুত ব্যাপার। গত দশ দিবস হইতে যাহা কিছু আপনি ব্যাখ্যা করিতেছেন তাহাতে এক হরিভক্তিই প্রচারিত হইতেছে। আপনার ব্যাখ্যাই সত্য, সকল শাস্ত্রের উদ্দেশ্যই এই, আমরা কর্ম্মদোষে বুঝিতে পারি না।" ছাত্রদিগের কথায় গৌরচন্দ্র সন্তুষ্ট হইলেন; এবং সকলকে মন খুলিয়া বলিলেন "দেখ ভাই, আর আমার কোন কথা বলা উচিত নয়। আমি সর্ব্বদাই এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিতে পাই, এই জন্য সর্ব্বক্ষণ তাঁহারই বিষয় কেবল বলিতে ইচ্ছা করে। কাণের কাছে হরিনামের শব্দ যেন দিন রাত্রি ভোঁ ভোঁ করিতেছে, সমস্ত জগৎ তাঁহারই মন্দির বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। তোমাদের নিকট এই নিবেদন, অদ্য হইতে আমাকে তোমরা বিদায় দাও, আর আমি পড়াইতে পারিব না। হরি ভিন্ন অন্য কথা

আর আমার মুখে আসে না, মনের কথা সব তোমাদিগকে প্রকাশ করিয়া বলিলাম।” নিমাই পণ্ডিতের কথাবার্ত্তা শুনিয়া ছাত্রবৃন্দ কাঁদিয়া আকুল হইল, এবং বলিতে লাগিল, “আপনার যে সঙ্কল্প আমাদেরও সেই সঙ্কল্প। এমন ব্যাখ্যান আর আমরা কোথায় শুনিতে পাইব? আশীর্ব্বাদ করুন, যাহা শুনিলাম তাহা যেন হৃদয়ে ধরিয়া রাখিতে পারি।” এই বলিয়া সকলে পুথি বাঁধিয়া গুরুবিচ্ছেদে কাঁদিতে লাগিল, এবং হরিধ্বনি করিল। চৈতন্য তাহাদিগকে কোলে করিয়া কাঁদিয়া বুক ভাসাইলেন, এবং আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, “আমি যদি এক দিনের জন্যও হরির দাস হইয়া থাকি, সেই পুণ্যবলে বলিতেছি, তোমাদের আশা পূর্ণ হউক! তোমরা সর্ব্বদা হরিনাম কর, আর তোমাদের পড়িবার প্রয়োজন নাই, কৃষ্ণের কৃপায় তোমাদের মুখে সর্ব্বশাস্ত্র স্ফূর্ত্তি পাইবে।” এই রূপে চৈতন্যের বিদ্যাবিলাস সাঙ্গ হইল। তদনন্তর তিনি হরিসঙ্কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। ছাত্রদিগকে বলিলেন, “এত দিনত পড়া শুনা করা গেল, আইস এক্ষণে আমরা সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করি।”

মত্ততা ও হরিসঙ্কীর্ত্তনারম্ভ।

ছাত্রেরা কেহ কেহ ভবিষ্যতের ভাবনায় অন্য স্থানে বিদ্যা অভ্যাস করিতে গেল, কেহ বা গুরুর সঙ্গে ধর্ম্মপথেও শিষ্য হইয়া রহিল। তাহারা বলিল আর্য্য, আমরাত কীর্ত্তন করিতে জানি না, কিরূপে করিতে হয় তাহা শিক্ষা দিন। তখন শচীনন্দন শিষ্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া একত্রে হরি-কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কেবল হরিনামমাহাত্ম্য বর্ণন আর করতালি, ইহাতেই সকলে প্রমত্ত হইয়া উঠিতেন। কোন কোন ছাত্র তাঁহার সঙ্গে উদাসীনের পথ অবলম্বন করেন। পরে সঙ্কীর্ত্তনে মাতিয়া গৌরচন্দ্র বালকের ন্যায় পুনঃ পুনঃ ভূমিতে লুটাইতে লাগিলেন। কখন বল! বল! বলিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠেন, কখন সবেগে ধরাতলে পতিত হন; তাঁহার পদভরে এবং দেহের আঘাতে মাটি কাঁপিয়া যাইত। হরিনাম শুনিয়া আর সকল বৈষ্ণবগণ তথায় উপনীত হইলেন। তাঁহারা দেখিয়া শুনিয়া বলিতে লাগিলেন, এমন প্রেম ভক্তি জগতে ছিল ইহাত আমরা জানিতাম না। যাহউক, বড় সুখী হওয়া গেল, হরিভক্তিবিহীন নবদ্বীপ পবিত্র হইল, আমরা দেখিয়া কৃতার্থ হইলাম। এমন দুর্লভ ভক্তি নারদাদি ভক্তগণেরও দুষ্প্রাপ্য।

পর দিন প্রাতে ভক্তগণ অদ্বৈতাচার্য্যকে এই শুভ সংবাদ দিবার জন্য তাঁহার ভবনে উপস্থিত হন। গৌরের অলৌকিক ভাবাবেশের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ অদ্বৈতের আর আনন্দের সীমা পরিসীমা রহিল না। তিনি গদগদ হইয়া সকলকে বলিলেন, কল্য আমি এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিয়াছি। আমি এক স্থানে গীতার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া দুঃখিত মনে অনাহারে নিদ্রিত ছিলাম, কে যেন আসিয়া বলিল, "শীঘ্র উঠিয়া ভোজন কর। যে জন্য তুমি এত উপবাস আরাধনা করিয়াছিলে তাহা পূর্ণ হইয়াছে। দেশে দেশে নগরে নগরে ঘরে ঘরে হরিসঙ্কীর্ত্তন হইবে, ব্রহ্মার দুর্লভ যে ভক্তি তাহা সকলে পাইবে। শ্রীবাসের ঘরে ভক্তগণ নৃত্য গীতে মজিবে।" ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখিলাম বিশ্বম্ভর সম্মুখে। বিশ্বরূপ যখন আমার নিকট গীতা পাঠ করিত, তখন মাঝে মাঝে পরম সুন্দর রূপবান্ এই শিশু অগ্রজকে ডাকিতে আসিত। বালকের রূপে মুগ্ধ হইয়া "ভক্তি হউক!" বলিয়া আমি

তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতাম। সম্ভ্রান্ত ভদ্র বংশে তাঁহার জন্মও বটে, আর তিনি নিজেও সর্ব্বগুণে বিভূষিত, আজ তোমাদের কথা শুনিয়া আমি বড় সুখী হইলাম।" এই বলিয়া তিনি আনন্দে হুঙ্কার ধ্বনি করিলেন, বৈষ্ণবগণ মহা আহ্লাদের সহিত কীর্ত্তন আরম্ভ করিল, এবং দলবদ্ধ হইয়া এই কথা ঘোষণা করিতে করিতে সকলে গঙ্গাস্নানে চলিয়া গেল।

নিমাই পণ্ডিত ভক্তিতে পাগলের মত হইয়াছেন, বিদ্যা বুদ্ধি পাণ্ডিত্য অধ্যাপনা সমুদায় বিসর্জ্জন দিয়াছেন, অহঙ্কার অভিমান পরিহার করিয়া দিবা নিশি হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন, এ কথা শুনিয়া ভক্ত বৈষ্ণবগণের মনে যেমন আনন্দ বৃদ্ধি হইল, তেমনি খ্যাতিলুব্ধ অন্ধকারে লুক্কায়িত অধ্যাপকগণের হৃদয়ও প্রফুল্ল হইল। এত বড় এক জন পণ্ডিত ধন মান সম্ভ্রমের আশা পরিত্যাগ করিলেন, ইহাতে তাঁহাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ পরিষ্কার হইয়া গেল, এই তাঁহাদের আহ্লাদের কারণ। আবার সামান্য জন কতক বৈষ্ণবদিগের সঙ্গে নিমাই পণ্ডিত মিশিলেন, ইহা ভাবিয়া বিদ্যাভিমানী নৈয়ায়িক দুই একজন পণ্ডিত তাঁহার উপর বিরক্তও হইল। কেন না বিদ্বান্ পণ্ডিত হইয়া ভাবুক ভক্তদলে প্রবেশ করা তাঁহাদের পক্ষে কিছু অপমানের বিষয়। শাক্ত বামাচারী এবং পাষণ্ডিগণ এ কথা শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

চৈতন্যের সাধুসেবা।

এক্ষণে গৌরাঙ্গ দেব সম্পূর্ণরূপে আর একটি নূতন পথ ধরিলেন। গঙ্গা-স্নানের পথে শ্রীবাসাদি বৈষ্ণবগণকে দেখিয়া বিনম্রভাবে প্রণাম করেন, তাঁহারাও আশীর্ব্বাদ করিয়া বলেন, "বাপ! কৃষ্ণপদে তোমার ভক্তি হউক! ভক্তি বিনা বিদ্যা কিছুই নয়। কৃষ্ণ জগৎপিতা, জগজ্জীবন, তাঁহাকে দৃঢ় করিয়া তুমি ভজনা কর।" চৈতন্য আশীর্ব্বাদ পাইয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিতেন, "আপনারা বিষ্ণুভক্ত, আপনাদের কৃপা হইলে আমি কৃষ্ণধন লাভ করিব।" এই বলিয়া কাহারো পায়ে ধরিতেন, কাহারো আর্দ্র বসন নিংড়াইয়া শুষ্ক বস্ত্র হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন, পূজার সামগ্রী গঙ্গামৃত্তিকা কুশ কাহারো হস্তে দিতেন, কোন দিন কাহারো ফুলের সাজি লইয়া যাইতেন, এইরূপে ভক্তসেবা আরম্ভ করিলেন। নিমাইকে বিনীত দেখিয়া তাঁহারা কুণ্ঠিত হইয়া বলিতেন হায়! হায়! এ কি কর! এ কি কর! তথাপি বিশ্বম্ভর ছাড়িবার পাত্র নহেন। বালক কালে এক ভাবে লোকের পা ধরিয়া টানিতেন, এখন আবার আর এক ভাবে আরম্ভ করিলেন। ভক্তির কি আশ্চর্য্য লীলা! সেই দেশবিখ্যাত নিমাই পণ্ডিত কি না পথে পথে ভক্তদিগের ধুতি এবং পূজার সামগ্রী স্বহস্তে বহিয়া লইয়া যাইতেছেন! বৈষ্ণবেরা কি বলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন তাহা আর খুঁজিয়া পান না। সকলে প্রসন্ন চিত্তে বলিতে লাগিলেন, "বাপ! তোমার হৃদয়ে কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া আমাদের সকল দুঃখ দূর করুন। যাহারা এখন আমাদিগকে পরিহাস করে তাহারা নামরসে ডুবিয়া যাউক। তোমার প্রসাদে আমরা হরিগুণ গান করিয়া কৃতার্থ হই। এই নবদ্বীপে যত যত পণ্ডিত আছেন, ভক্তি বিষয়ে সকলে বকের ন্যায়। তপস্বী সন্ন্যাসী গৃহী সকলেই হরিরসবিমুখ। তাঁহাদের দৃষ্টান্তে পাপিষ্ঠ মানবগণ আমাদিগকে উপহাস করে, তাহাদের দৌরাত্ম্যে আমরা জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি। তোমা দ্বারা আমাদের সকল আশা পূর্ণ হইবে এই জন্য দীনবন্ধু হরি তোমাকে এ পথে আনিয়াছেন।" এই বলিয়া প্রাচীন ভক্তগণ তাঁহার গায়ে হাত দিয়া ঐকান্তিক ভাবে আশীর্ব্বাদ করিতেন। তাঁহাদের প্রসন্নতা

লাভ করিয়া চৈতন্য বলিতেন, ''আপনারা আমাকে যদি ভাল বলিলেন, ইহাতেই আমি ধন্য হইলাম। সকলে সুখে হরিসঙ্কীর্ত্তন কর, ভক্তের দুঃখ ভগবান্ চির দিন রাখেন না। আমাকে তোমরা সেবক বলিয়া জানিবে, কখন বিস্মৃত হইবে না।'' এই রূপে কিছু দিন ভক্তগণের পদধূলি ও আশীর্ব্বাদ লইয়া বিশ্বম্ভর গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন।

বিরহজ্বালা এবং নিত্য সঙ্কীর্ত্তন।

ভক্তির যে বিচিত্র ভাবরসে এক্ষণে গৌরাঙ্গ ভাসিতে লাগিলেন, তাহার স্বরূপ বর্ণনা করা অসাধ্য। কখন ক্রন্দন, কখন হাস্য, কখন ভূমিতে লুণ্ঠিত। বনিতা বিষ্ণুপ্রিয়া নিকটে আসিলে তাঁহাকে তাড়াইয়া যান, আপন মনে কি কথা বলেন, দন্ত ঘর্ষণ করেন, কখন গাছে চড়েন, মুখে কথা নাই, চক্ষু মুদ্রিত, পাষণ্ডী দেখিলে তাহাদের পশ্চাতে ধাবিত হন। হুঙ্কার গর্জ্জন নানা ভাব দেখিয়া কেহ পাগল বলিয়া হাস্য করে, কেহ বলে ভূতে পাইয়াছে। শচীমাতা দেখিয়া শুনিয়া হতবুদ্ধি হইলেন। প্রতিবাসীরা তাঁহাকে বলিতে লাগিল, "ঠাকুরাণী, তুমি কি দেখিতেছ? তোমার ছেলের বায়ুরোগ জন্মিয়াছে, হাতে পায়ে দড়ি দিয়া বাঁধ, নারিকেলের জল খাইতে দাও, গায়ে শিবাঘৃত এবং মাথায় পাকতৈল মাখাইয়া স্নান করাও, ঊর্দ্ধ বায়ু হইয়াছে আপনি এখনি নামিয়া যাইবে।" সরলমতি শচীদেবী যে যাহা বলে তাহাই করেন, ভাবনায় তাঁহার চিত্ত মহা ব্যাকুলিত হইল। একমাত্র সন্তান, তাহার আবার এই দশা, দিশাহারা হইয়া তিনি পাঁচ জনের কাছে দুঃখ করিতে লাগিলেন। শ্রীবাসের নিকট লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া আনিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া গৌরাঙ্গের ভক্তি আরও উথলিয়া উঠিল। থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন, ক্ষণে ক্ষণে অশ্রু কম্প পুলক, একবারে তাঁহাকে যেন অস্থির করিয়া তুলিল। লোকে ধর্ম্ম করে খায় দায়, ঘরকন্না করে, বেশ কোন উৎপাত নাই; তাহাদের সংসারের প্রতি কেমন উজ্জ্বল দৃষ্টি; চৈতন্যের এ এক সৃষ্টিছাড়া ভাব। বিকারী রোগীর অপেক্ষা তাঁহার বিরহজ্বালা অধিক। কোথা হইতে চক্ষে এত জল ঝরিত ভাবিয়া কেহ কিছু ঠিক করিতে পারিত না। একটু চেতনা লাভ করিয়া তিনি শ্রীবাসকে বলিলেন, "পণ্ডিত, তুমি কি বল? বায়ুগ্রস্ত বলিয়া যে আমাকে লোকে বাঁধিয়া রাখিতে চায়?" শ্রীবাস হাসিয়া বলিলেন, "ভাই, তোমার যে এ রোগ, এ শিব ব্রহ্মাদি দেবতাদিগেরও বাঞ্ছনীয়। কৃষ্ণের অনুগ্রহ হইয়াছে, তাই তোমাতে মহাভক্তির লক্ষণ সকল আমি দেখিতেছি।" সে কথা শুনিয়া পণ্ডিতকে তিনি আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "তোমার কথায় আজ

আশা হইল।" শ্রীবাস শচীকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন। তিনিও তখন কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিলেন।

এইরূপে কিছু দিন যায়, এক দিন বিশ্বম্ভর গদাধরকে সঙ্গে লইয়া অদ্বৈতের সঙ্গে দেখা করিতে চলিলেন। উভয়ের সম্মিলনে মহা আনন্দ উপস্থিত হইল। শচীকুমারকে দেখিবামাত্র প্রমত্তের ন্যায় দুই বাহু প্রসারিত করিয়া আচার্য্য তাঁহাকে আলিঙ্গন দান করিলেন, এবং হুঙ্কার রবে হরি হরি বলিয়া উঠিলেন। দেখিয়া শুনিয়া চৈতন্যের মূর্চ্ছা হইল। অদ্বৈত যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। পরে উভয়ে অনেক মিষ্টালাপ হয়। ভক্তিভাবের আর অন্ত নাই, ভক্ত যাহা দেখেন তাহাতেই ভাবের উদয় হয়, ভক্তসঙ্গ পাইলে হৃদয়মধ্যে প্রবল বন্যা আসে। অদ্বৈত প্রাচীন হইয়াও এই যুবকের পদসেবা করিলেন। গৌরও সে বিষয়ে ঠকিবার লোক নহেন। আচার্য্য বলিলেন, যাহাতে সর্ব্বদা দেখা সাক্ষাৎ হয় তাহা করিতে হইবে, তোমাকে লইয়া বৈষ্ণবগণ কীর্ত্তন করেন এই তাঁহাদের ইচ্ছা। তাহাতে সম্মত হইয়া বিশ্বম্ভর গৃহে চলিয়া গেলেন, এবং প্রেম পরীক্ষার জন্য অদ্বৈত শান্তিপুর গমন করিলেন।

অতঃপর ভক্তসঙ্গে গৌরাঙ্গ কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। এক এক করিয়া সকলের সহিত ক্রমে বন্ধুতা জন্মিয়া গেল। পরিশেষে এমনি হইল যে কেহ আর কাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে চাহেন না। তাঁহাকে পাইয়া বৈষ্ণবগণ পরমাহ্লাদিত হইলেন। পরস্পরকে তাঁহারা এত ভাল বাসিতে লাগিলেন যে সকলের হৃদয় যেন এক হইয়া গেল। আহা! সে যেন পৃথিবীতে স্বর্গের ছবি। এমন প্রেম, প্রগাঢ় বন্ধুতা, অপূর্ব্ব সৌহৃদ্য আর কোথাও দেখা যায় না। যত প্রেম ভক্তি অনুরাগ স্নেহ মমতা ছিল সমুদায় ইহাঁরা পরস্পরকে দিয়া সুখসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। গৌরাঙ্গ সকলেরই পরমপ্রিয় হৃদয়ানন্দকর হইয়া বন্ধুমণ্ডলীতে বিরাজ করিতে লাগিলেন। ভক্তির নানা ভাব গৌরের জীবনে লক্ষিত হইত। কখন আনারসের ন্যায় তাঁহার শরীর কণ্টকিত, কখন অসাড় স্তম্ভের ন্যায়, কখন নবনীতের ন্যায় কোমল ভাব ধারণ করিত। যতই দিন যাইতে লাগিল ততই তাঁহার হরিবিরহানল প্রবল হইয়া উঠিল। কোথা নাথ! কোথা প্রাণধন! ইহা ভিন্ন আর মুখে অন্য কথা নাই। অপর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেন না। যাহাকে দেখেন তাহাকেই ব্যাকুল হইয়া বলেন, "ও গো! কৃষ্ণ কোথা বলিতে

পার ?" মাতৃহারা শিশুর ন্যায় নিতান্ত ব্যাকুল হইতেন। এক দিন কীর্ত্তনের পর ভক্তগণের নিকট কানাইনাটশালে যে তাঁহার ঈশ্বরদর্শন হয় সেই কথা বলিতে বলিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। বলিলেন "সেই মনোহর রূপ, সহাস্য মুখ যে দিন হইতে আমি দেখিয়াছি সেই অবধি আমার প্রাণ তাঁহার জন্য অস্থির হইয়াছে। তিনি হাসিতে হাসিতে নিকটে আসিয়া আমাকে আলিঙ্গন দান করিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন আর দেখা পাইলাম না। হায়! আমার কি দুর্ভাগ্য, আমি জীবনবল্লভকে পাইয়াও হারাইলাম!" গয়াধামে গিয়া চিত্তের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল বন্ধুগণকে গৌর তাহা আদ্যোপান্ত বলিলেন এবং সেই দর্শনের কথা স্মরণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। দুই চক্ষে শতধারা বহিতে লাগিল। এত ব্যাকুলতা, ক্রন্দন আর কোথাও দেখা যায় না। পুত্রশোকে কাতরা জননীও এত কাঁদিতে পারেন না। এক দিন গদাধরকে দেখিয়া বলিলেন, "আমার কৃষ্ণ কোথায়, তুমি তাঁহাকে আনিয়া দিতে পার?" তিনি বলিলেন, "কৃষ্ণ হৃদয়ে আছেন।" সে কথা শুনিয়া গৌর নখদ্বারা বক্ষ বিদারণ করিতে উদ্যত হইলেন। মহা বিপদ দেখিয়া গদাধর শেষ বলিলেন, ক্ষান্ত হও, স্থির হও, তিনি এখনি তোমাকে দেখা দিবেন। শচী গদাধরকে প্রশংসা করিয়া বলিলেন বাপ, তুমি বড় বুদ্ধিমান্, তুমি আমার গৌরের সঙ্গ কখন ছাড়া হইও না।

ইদানীং শচী আর পুত্র বলিয়া গৌরকে প্রাকৃতভাবে বড় দেখিতেন না, বুঝিতে পারিলেন যে এ সামান্য ছেলে নয়। এই জন্য ভক্তির চক্ষে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। নিকটে যাইতে সঙ্কুচিত এবং ভীত হইতেন। সন্ধ্যা হইলেই হরিভক্ত সঙ্গিগণ শচীগৃহে আসিয়া উপস্থিত হন এবং সকলে মিলিয়া কোন কোন দিন সমস্ত রাত্রি সঙ্কীর্ত্তন করেন। মুকুন্দের বেশ মিষ্ট স্বর ছিল, তিনি সুর করিয়া ভাগবত পড়িতেন এবং গানও করিতেন, তাহা শুনিবামাত্র চৈতন্যের ভাবের তরঙ্গ উথলিয়া উঠিত। গৌরের মত্ততা বিদ্যুতের ন্যায় সকলের চিত্তে সংক্রামিত হইত। এইরূপে হরিসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল।

কিছু দিনান্তে শ্রীবাস পণ্ডিতের ভবনে প্রতিসন্ধ্যাকালে ভক্তগণ গৌরাঙ্গের সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যাকালে পল্লিগ্রামবাসী বিষয়ী জীব সকল নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়, কিন্তু ইঁহাদের চক্ষে আর নিদ্রা নাই; সকলে মিলিয়া উচ্চৈঃস্বরে সঙ্কীর্ত্তন করেন। সাধুবিদ্বেষী ভক্তিবিরোধী সুখাসক্ত

প্রতিবাসিগণ মহা বিরক্ত হইতে লাগিল। কীর্ত্তনের অন্তর্ভেদী শব্দে তাহাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, আর রাগিয়া মরে। বলে ভাই, ইহারা পাগল হইল না কি! নিদ্রা যাইতে দেয় না, রাত্রি দুই প্রহরের সময় চীৎকার শব্দ, এ যে বড় বিপদ হইল দেখিতেছি! ইহারা জ্ঞানযোগ বিচারপথ ছাড়িয়া এরূপ গোলযোগ করে কেন? মনে মনে হরি বলিলে কি আর পুণ্য হয় না? শ্রীবাস ব্রাহ্মণটা করে কি? কেহ বলে ভাই বড় প্রমাদ হইল, এই ব্রাহ্মণের জন্য আমাদের শুদ্ধ সর্ব্বনাশ হইবে। শুনিলাম নবাব দুই খান নৌকা পাঠাইয়াছে, শ্রীবাসকে ধরিয়া লইয়া যাইবে। শেষ ও বামুন পলাইবে, আমাদিগকে লইয়াই টানাটানি পড়িবে। কেহ বলে, ভাই রাজার লোক আসিলে আমরা উহাকে ধরিয়া দিব, তাহারা বাঁধিয়া লইয়া যাইবে।

নিরামিষভোজী হরিভক্ত বৈষ্ণবগণ নিতান্ত সরলচিত্ত, যে যাহা বলে তাহাতেই বিশ্বাস করেন, নবাবের লোক ধরিতে আসিয়াছে নগরময় এই কথা রাষ্ট্র হইল। চৈতন্য দেব ইহাঁদিগকে সাহস দিবার জন্য অঙ্গে চন্দন লেপন করিয়া, গলায় ফুলের মালা পরিয়া, সুন্দর বস্ত্র পরিধান করিয়া ভক্তসঙ্গে গঙ্গাতীরে বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থল, আজানুলম্বিত বাহু, আয়ত লোচন, চিকুর কুন্তল,নবীন যৌবনের সুন্দর দেহশোভা, প্রেমোজ্জ্বল মুখদ্যুতি দর্শনমাত্র ভবভয় দূর হইত। নির্ভয়ে তাঁহাকে বিচরণ করিতে দেখিয়া বিদ্বেষীরা রাগে গর গর করিতে লাগিল। কেহ বলে, ইহার মনে কি একটু মাত্র ভয় নাই? কেহ বলে তা নয় হে, নিমাই পণ্ডিত পলাইবার পথ দেখিয়া বেড়াইতেছে। ভাগীরথীর নির্ম্মল জলস্রোতঃ এবং সিকতাময় সুন্দর পুলিন দেখিতে দেখিতে গৌরের ভাবোদয় হইল, তৎক্ষণাৎ অতি বেগে একবারে তিনি শ্রীবাসের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থানই ভক্তগণের বিলাসমন্দির ছিল। শ্রীবাস তখন ঘরের মধ্যে নৃসিংহ পূজা করিতেছিলেন। গৌর সিংহ তাঁহার দ্বারে সবলে আঘাত করিয়া উত্তেজিত ভাবে বলিতে লাগিলেন, "তুই এখনও নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছিস? সে বুড়ো অদ্বৈত আমাকে ফেলিয়া কোথায় গেল?" গৌরের মত্ততা দেখিয়া শ্রীবাস কাঁপিতে লাগিলেন, বাড়ীর পরিবারেরা ভয়ে তটস্থ হইল, সকলে তাঁহার চরণ ধরিয়া স্তুতি নতি করিল। তদনন্তর গৌরাঙ্গ প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "ও হে শ্রীবাস! তোমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে এ ভয় কি এখনও তোমার আছে? যদি ধরে, তবে আমি

অগ্রগামী হইব, রাজদ্বারে আমি প্রথমে যাইব, নবাব কাজি সকলকে হরিভক্তিতে কাঁদাইয়া আসিব। নামসঙ্কীর্ত্তনে তাহাদিগকে মাতাইব। নবাবের পশু পক্ষী হাতী ঘোড়াকে পর্য্যন্ত ভক্তিরসে মত্ত করিব।” কি অদ্ভুত সাহসের কথা! দৈব বল যাহার অন্তরে অবতীর্ণ হয় সে আর কোন মানুষকে ভয় করিয়া চলে না। বিশ্বাধিপতি পরম দেবতার অনুচরগণ সামান্য কপট বিনয়, লৌকিক দীনতা দেখাইয়া স্বীয় প্রভুর অজেয় শক্তিকে কলঙ্কিত করেন না। এই জন্য স্থূলদর্শী মানবেরা তাঁহাদিগকে অনেক সময় অহঙ্কারী গর্ব্বিত বলে, কিন্তু তাঁহারা বিনয়ী এবং সত্যবাদী হইয়া বজ্রনির্ঘোষে প্রভুর আজ্ঞা প্রচার করেন। ভয় তাঁহাদের নিকট ভয় পাইয়া পলায়ন করে।

বৎসরাবধি এইরূপে কীর্ত্তন হইতে লাগিল। ভক্তগণ পরিবার স্ত্রী পুত্রের মায়া মমতা কাটাইয়া গৌরের সঙ্গেই দিবানিশি থাকেন। ধরাতলে এমন পবিত্রসঙ্গ পাইয়া কেই বা তাহা ছাড়িয়া থাকিতে পারে?

ভক্তসম্মিলন।

গৌরসুন্দর এক দিন বন্ধুবর্গকে বলিলেন, "দেখ ভাই, কল্য রাত্রিতে আমি এক বড় আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়াছি। যেন এক অবধূতবেশধারী সৌম্য-মূর্ত্তি বিচিত্র পুরুষ আসিয়া আমাকে অন্বেষণ করিতেছেন। তিনি আমাকে হাস্য মুখে ভাই বলিয়া সম্বোধন করিলেন।" স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিতে বলিতে তাঁহার ভাবাবেশ হইল, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, এবং মদ আন, মদ আন বলিয়া হুঙ্কার শব্দ করিতে লাগিলেন। শ্রীবাস বলিলেন, গোসাঞী! যে মদিরা তুমি চাহিতেছ তাহাত তোমারই নিকট আছে, তুমি যাহাকে তাহা বিলাও সেই কেবল তাহা পায়। ক্ষণকাল পরে প্রেমোন্মত্ত গৌরচন্দ্র আরক্ত নয়ন উন্মীলন করিয়া হাস্যমুখে পদদ্বয় দোলাইতে লাগিলেন। তাঁহার বিকসিত মুখারবিন্দ যেন একখানি আনন্দ এবং ভাবরসের ছবি! ইহার কয়েক দিন পরে নিত্যানন্দ ঠাকুর নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। প্রথমে তিনি নন্দন আচার্য্যের গৃহে আসিয়া সমাগত হন, পরে ভক্তদলে মিশিয়া শ্রীবাসভবনে অবস্থিতি করেন। ইনিও এক দ্বিতীয় গৌরাঙ্গ বিশেষ, সংক্ষেপে ইঁহার পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

বীরভূম অঞ্চলে সাঁইথিয়ার নিকটবর্ত্তী একচাকা গ্রামে হাড় ওঝার ঔরসে পদ্মাবতীর গর্ভে ঠিক চৈতন্যের জন্মদিনে নিত্যানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রামে মৌড়েশ্বর বলিয়া এক দেবতা ছিল। হাড় ওঝা এবং পদ্মাবতী উভয়েই নির্দ্দোষচরিত্র দয়ালুস্বভাব এবং ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। একমাত্র পুত্র নিত্যানন্দ, তাহার প্রতি উভয়ের প্রগাঢ় স্নেহ বাৎসল্য, তাহাকে এক দণ্ড কোথাও ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। এক দিন হঠাৎ এক সন্ন্যাসী অতিথি হইয়া বলিল, এই ছেলেটি ভিক্ষা দিতে হইবে, আমি ইহাকে সঙ্গে রাখিব। কিছু দিনের জন্য আমাকে দাও, আমি তোমার ছেলেকে সর্ব্বদা যত্নে রাখিব এবং তীর্থ ভ্রমণ করাইব। অতিথির কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণের মুখ শুকাইয়া গেল, অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল; তথাপি তাঁহার প্রার্থনা তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। স্ত্রীকে সে কথা বলিলেন, তিনিও আর আপত্তি করিতে সাহসী হইলেন না। প্রাণাধিক সন্তানকে

ধর্ম্মের অনুরোধে বিদায় দিতে হইল। বিদায় দিয়া বাতাহত কদলীতরুর ন্যায় ভূমিতে পড়িয়া দুইজনে কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহাদের রোদনে কাষ্ঠ পাষাণ পর্য্যন্ত ভেদ হইয়া গেল। আশ্চর্য্য এই যে, এমন স্নেহের পাত্রকে ধর্ম্মের জন্য ছাড়িতে হইল। ব্রাহ্মণ তিন মাস পর্য্যন্ত অন্ন জল ত্যাগ করিয়াছিলেন। স্বামী স্ত্রী পুত্রশোকে পাগলের মত হইয়া কোন রূপে বাঁচিয়া রহিলেন। বালক নিত্যানন্দ সেই সন্ন্যাসীর সঙ্গে নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া শেষ মথুরাধামে কিছু দিন অবস্থান করেন। মাধব পুরী নামক ভক্ত ব্রহ্মচারীর সঙ্গে তাঁহার অত্যন্ত প্রণয় হইয়াছিল। মথুরায় থাকা-কালীন লোকমুখে নবদ্বীপে চৈতন্যের ভক্তিলীলার কথা তিনি শুনিতে পান, শুনিয়া একেবারে এখানে উপস্থিত হইলেন। ভক্তদিগের পরস্পরের মধ্যে আধ্যাত্মিক নিগূঢ় যোগ অবস্থিতি করে। দূরে থাকিয়াও তাঁহারা আপনার জনের সংবাদ পান।

অবধূত নিতাই নন্দন আচার্য্যের ভবনে উপস্থিত হইয়াছেন শুনিয়া সবান্ধবে চৈতন্যচন্দ্র তাঁহাকে আনিতে গেলেন। নিতাইয়ের তেজঃপুঞ্জ দেহে, এবং ভক্তিরসরঞ্জিত মুখমণ্ডলে তপস্যার পুণ্যাগ্নি দীপ্তি পাইতেছিল। তিনি ব্রাহ্মণের ঘর যেন আলো করিয়া বসিয়া আছেন, ইত্যবসরে শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত গৌর তাঁহাকে গিয়া প্রণিপাত ও আলিঙ্গন দান করিলেন। দুইটী বেগবতী স্রোতঃস্বতী কোন স্থানে মিলিত হইলে যেরূপ তরঙ্গ এবং লহরী উঠে, উভয়ের প্রতিঘাতে চারিদিক্ বিকম্পিত হয়, এবং পরে দুই স্রোতঃ মিলিত হইয়া খরতর বেগে যেমন সমুদ্রাভিমুখে গমন করে, গৌর নিত্যানন্দের সঙ্গম তদ্রূপ হইয়াছিল। চারিদিকে ভক্তবৃন্দ, মধ্যে গৌর নিতাই, সোণার প্রতিমার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। এক নিমে-ষের মধ্যে সকলের সঙ্গে সকলের পরিচয় হইল, যেন জলে জল মিশিয়া গেল; যূথভ্রষ্ট হরিণ যেন স্বদলের মধ্যে প্রবেশ করিল। একা চৈতন্যের মত্ততায় নবদ্বীপ কাঁপিতেছিল, নিত্যানন্দের সমাগমে নগর টল মল করিতে লাগিল। নন্দন আচার্য্যের ঘরে যেরূপ ভয়ঙ্কর নৃত্য গীত হয় তাহা আর বলিবার নহে। দুটি প্রকাণ্ড মদস্রাবী প্রমত্ত মাতঙ্গ যেন মেদিনী দলন করিতে লাগিল। নবদ্বীপের লোকসকল নিত্য নূতন ব্যাপার দেখিয়া তখন কি বলিবে তাহা আর ঠিক করিতে পারে না। দেখিয়া শুনিয়া তাহাদের মনে ভয় বিস্ময়, তৎসঙ্গে অজ্ঞাতসারে ভক্তি সঞ্চারিত হইতে;

তথাপি অভ্যাস বশতঃ কেহ নিন্দা করিতেও ছাড়িত না। কিন্তু এই দুই মদমত্ত বীরকে দেখিয়া অনেক বড় বড় পণ্ডিতের হৃদয় কাঁপিয়াছিল। অনন্তর সুগভীর নিনাদে হরিধ্বনি করিতে করিতে নিত্যানন্দকে লইয়া সকলে শ্রীবাসভবনে প্রবেশ করিলেন। নিত্যানন্দ প্রেমভরে টলিতে টলিতে চলিলেন, সে শোভা দেখিলে মন মাতিয়া উঠে। তথায় বাহিরের লোক কেহ যাইতে পারিল না। ভক্তগণসঙ্গে নিতাইয়ের গলা ধরিয়া গৌরাঙ্গদেব মহাকীর্ত্তন ও নৃত্য আরম্ভ করিলেন। সে দিন সঙ্কীর্ত্তনের ধূমে আকাশ মেদিনী প্রকম্পিত হইয়াছিল। প্রেমোন্মত্ত ভক্তবৃন্দের ভক্তির বিলাস এক অদ্ভুত দৃশ্য, মদ্যপের ন্যায় অথবা পাগলের ন্যায় তাঁহাদের ব্যবহার। হুড়োমুড়ি, কোলাকোলি ; কেহ কাহার পায়ে ধরে, কেহ গলা ধরিয়া কাঁদে, কেহ হাসে, প্রেমেতে যেন একেবারে সব পাগল! ভাবাবেশে নিতাই গৌর উভয়েই অজ্ঞান এবং উন্মত্ত হইলেন। মত্ততার বেগে অবধূতের কৌপীন বহির্ব্বাস, দণ্ড কমণ্ডলু কোথায় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গেল! কোথায় কাহার অঙ্গের বসন পড়িল তাহার আর ঠিক রহিল না। সে দাপাদাপি লম্ফ ঝম্প, মাতামাতি দেখিলে মনে ভয় উপস্থিত হয়। এক জন জীবন্ত মনুষ্য নবদ্বীপে আছেন এবং আর এক জন তাঁহার সঙ্গে আসিয়া জুটিলেন, ইহা সকলে বিলক্ষণ টের পাইল। চৈতন্য মদ আন, মদ আন বলিয়া এক একবার চীৎকার করিতে লাগিলেন। ভাবে মাতিয়া ঘটি ঘটি জলই খাইয়া ফেলিলেন। সেই দিন তিনি অদ্বৈতের কথা বার বার বলিয়াছিলেন। বলিলেন, "এমন সময় নাড়া হরিদাসকে লইয়া কোথায় রহিল? এখন ঘরে ঘরে হরিনাম প্রচারিত হইবে, তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া ঘরে গিয়া বসিয়া রহিলেন?" বাস্তবিক এ সময় অদ্বৈতের এখানে থাকাটা উচিত ছিল। এমন শুভ যোগের সময় কি বিচ্ছিন্ন থাকা শোভা পায়? কতক্ষণে সুস্থির হইয়া বিশ্বম্ভর গৃহে গমন করিলেন, নিতাইকে শ্রীবাসের ঘরে রাখিয়া গেলেন। পর দিনে পুনরায় ব্যাসপূজা উৎসব উপলক্ষে এই স্থানে সকলে সঙ্কীর্ত্তনাদি করেন। এমন আনন্দের সময় অদ্বৈতকে না দেখিতে পাইয়া শচীনন্দন শেষ রামাই পণ্ডিতকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেন।

অদ্বৈত আচার্য্য মাধবেন্দ্র পুরীর নিকট ভক্তি শিক্ষা করেন। দেশে ভক্তির অভাব দেখিয়া তিনি নিয়ত দুঃখিত থাকিতেন। তিনিই চৈতন্যের

অগ্রে এ দেশে ভক্তির পথ সকলকে দেখান। গৌর তাঁহার আশা পূর্ণ করিতে আসিয়াছেন কি না তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য আচার্য্য গোসাঞী শান্তিপুরে বসিয়া কয়েক দিন অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইনিও একজন পরম ভক্ত মহৎ মনুষ্য। রামাই পণ্ডিত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, গোসাঞী আপনাকে স্মরণ করিয়াছেন, সপরিবারে শীঘ্র তথায় চলুন, বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার হইতেছে, নিত্যানন্দ আসিয়াছেন, এমন সময় আপনার এখানে থাকা ভাল দেখায় না। বৃদ্ধ ঈষদ্ধাস্য করিয়া বলিলেন, কে তোমার গোসাঞী? শাস্ত্রে এমন কিছু নাই যে নবদ্বীপে অবতার হইবে। এইরূপে ক্ষণকাল আমোদ করিয়া পরে যখন রামাই পণ্ডিতের মুখে বিস্তারিত বিবরণ শুনিলেন তখন আর না কাঁদিয়া তিনি থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার পত্নী সীতাদেবী এবং আর সকলে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন, ভাবাবেশে অদ্বৈতের মূর্চ্ছা হইল।

তদনন্তর সপরিবারে অদ্বৈত গোসাঞী নবদ্বীপে আসিয়া চৈতন্যচরণে প্রণত হইলেন, এবং বহু বিনয় সহকারে স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন। তাঁহার আগমনে শ্রীবাসের ভবনে আবার এক নূতন উৎসব হইল। ভক্তমণ্ডলীর মাঝে মহা ধূম পড়িয়া গেল; কেহ হাসে, কেহ গায়, কেহ নাচে, কেহ কাঁদে, কেহ গড়াগড়ি দেয়: ঠিক যেন বাল্যখেলা। যে কয়েক জন মহাত্মা একত্র সমবেত হইয়াছিলেন তাঁহারা প্রত্যেকেই এক এক জন পরম ধার্ম্মিক, তাঁহাদিগকে দেখিলেও পুণ্য হয়। এক্ষণে তিনটি প্রবল ভক্তির স্রোত একত্রিত হইল, যেন যমুনা এবং সরস্বতী গঙ্গাস্রোতের সঙ্গে মিশিয়া গেল। নিত্যানন্দের সঙ্গে অদ্বৈতের আলাপ হইল। তাহার পর চৈতন্য অদ্বৈতকে বলিলেন, তোমাকে কীর্ত্তনে নাচিতে হইবে। বৃদ্ধ নৃত্যেতে বড় পটু ছিলেন। নানা অঙ্গভঙ্গী করিয়া খুব নাচিতে লাগিলেন। যেমন কীর্ত্তনানন্দ, তেমনি নৃত্য। সঙ্কীর্ত্তন ভঙ্গ হইলে চৈতন্য বলিলেন, "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে, আচণ্ডালে আমি ভক্তি বিলাইব, হরিনাম শুনাইব।" অদ্বৈত ইহা শুনিয়া মহা হরষিত হইলেন। ভক্তসমাজ ক্রমেই এক এক করিয়া পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

অদ্বৈত এবং নিতাইকে পাইয়া মহাপ্রভুর মত্ততার আর অবধি রহিল না। সঙ্কীর্ত্তনের উৎসাহ চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। এই আনন্দের মধ্যে "পুণ্ডরীক বাপ! তুমি কোথায় রহিলে"—এই বলিয়া তিনি বার বার কাঁদিতে

লাগিলেন। অন্য ভক্তগণ তাঁহাকে ভাল চিনিতেন না। তাঁহারা সকলে এক দিন বলিলেন ঠাকুর, তিনি কে? গৌর তাঁহার পরিচয় দিয়া পুনর্ব্বার প্রেমনিধি বাপ বলিয়া কাঁদিলেন। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি একজন চট্টগ্রাম-বাসী পণ্ডিত, পূর্ব্বে নবদ্বীপেই থাকিতেন, মধ্যে কিছু দিনের জন্য দেশে গিয়া অবস্থিতি করেন। মুকুন্দের সঙ্গে তাঁহার বড় বন্ধুতা ছিল, এক দেশে দুই জনের বাস। বিদ্যানিধি এই সময় নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হন। গদাধর মুকুন্দের এক জন পরম বন্ধু। মুকুন্দ তাঁহাকে বলিলেন, একজন সাধু আসিয়াছেন দেখিবে চল। গদাধর মুকুন্দের সমভিব্যাহারে বিদ্যানিধিকে দেখিতে গেলেন। গিয়া দেখেন, একজন ঘোর বিষয়ী বিলাসপরায়ণ, অতি সৌখীন লোক, হিঙ্গুলরঞ্জিত পিত্তলের পায়াযুক্ত দিব্য চন্দ্রাতপ-আচ্ছাদিত পর্য্যঙ্কে বসিয়া পান তামাক খাইতেছেন। তাঁহার পরিধান সূক্ষ্ম বসন, নাসিকায় তিলক, ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, কেশজাল আমলকি ইত্যাদি গন্ধ দ্রব্যে সংস্কৃত, সম্মুখে রূপার পানের বাটা তাহাতে পাকা পান, উভয় পার্শ্বে ছোট বড় ঝারি, বিবিধ বিলাসসামগ্রী, ময়ুরপুচ্ছের পাখাদ্বারা দুই জন লোক বাতাস করিতেছে, বালিশ বিছানা অতি পরিষ্কৃত, সর্ব্বতোভাবে এক জন বাবু হইয়া তিনি বসিয়া আছেন। গদাধর বালক কাল হইতে বিরক্ত বৈরাগী, এ সকল দেখিয়া তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ এবং বিরক্ত হইলেন; ভাবিলেন ভাল সাধু দেখিতে আসিয়াছি বটে! এ ব্যক্তিত বিষয়ীর শিরোমণি! মুকুন্দ গদাধরের মনোভাব আভাসে বুঝিতে পারিয়া মধুর স্বরে একটি ভক্তিরসাত্মক শ্লোক পাঠ করিলেন। যাই তিনি শ্লোক পড়িতে আরম্ভ করিলেন, অমনি পুণ্ডরীকের চক্ষু দিয়া দরদরিত ধারে অশ্রু পড়িতে লাগিল। ক্রমে তিনি একেবারে অস্থির এবং উন্মত্ত হইয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। পদাঘাতে বিলাস দ্রব্য সামগ্রী কোথায় গিয়া পড়িল, সুখসেবিত সেই মার্জ্জিত দেহ এবং সুন্দর কেশপাশ মলিন এবং হতশ্রী হইয়া গেল। তাহার উপর অনুতাপের ক্রন্দন! "কোথায় আমার কৃষ্ণ প্রাণধন! হায়! আমার জন্ম বৃথা গেল।" এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। তখন গদাধর বুঝিলেন যে এ ব্যক্তি বাহিরে বিষয়ী ভিতরে ভক্ত। না জানিয়া অশ্রদ্ধা এবং উপেক্ষা করিয়াছেন সে জন্য তিনি মনে মনে বড় ব্যথিত হইতে লাগিলেন। গদাধর এই অপ-রাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ শেষ বিদ্যানিধির নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। শিষ্যত্ব

স্বীকার করিয়া সকল অপরাধ ভঞ্জন করিলেন। দুই প্রহরের পর বিদ্যানিধির চেতনা লাভ হইল। মুকুন্দ গদাধরের পরিচয় দিয়া বলিলেন, ইনি মাধব মিশ্রের পুত্র, অতি সুশীল বিষ্ণুভক্ত বৈরাগী, ইনি আপনার নিকট দীক্ষিত হইবেন। এ কথা শুনিয়া পুণ্ডরীক তাঁহাকে কোলে করিয়া ভাবে গদগদ হইলেন। গদাধরও বিগলিত হৃদয়ে তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন।

অনন্তর মুকুন্দ ও গদাধরের সঙ্গে বিদ্যানিধি মহাপ্রভুর আবাসে চলিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া গৌরের বিপুল আনন্দোচ্ছ্বাস হইল। তিনি বিদ্যানিধিকে কোলে লইয়া তাঁহার প্রশংসা গান করত এত আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন যে তাহা দেখিয়া পুণ্ডরীক যে এক জন বড় লোক তাহা সকলকে বুঝিতে হইল। বিলাস সুখ সংসারমায়ার মধ্যে থাকিয়াও বিদ্যানিধি এমন প্রেমিক এবং ভক্ত ছিলেন। গদাধর ইহাঁকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এ সংবাদে চৈতন্যের মহা সন্তোষ জন্মিল। ভক্তে ভক্তে মিলনের সময় তখন একটা মহা ব্যাপার হইত। সকলেই যেন এক একটি আহ্লাদের পুতুল। তাঁহারা পরস্পরের প্রতি এরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা ভালবাসা প্রকাশ করিতেন যে তাহা দেখিলে অবাক্ হইয়া থাকিতে হইত। ভাবে প্রেমে একেবারে যেন মাখামাখি ছিল। বিশ্বম্ভরের দুর্জ্জয় প্রেম যাহাকে একবার আক্রমণ করিত তাহার অস্থি পর্য্যন্ত চূর্ণ হইয়া যাইত। ভক্তদিগের মধ্যে আহ্লাদ আমোদের অল্পতা ছিল না। কীর্ত্তনে মাতিয়া কেহ কাহারো পা ধরিয়া টানিতেন, কেহ কাহারো স্কন্ধে আরোহণ করিতেন, কেহ বা কাহারো কোলে মাথা দিয়া শুইতেন, এক জনের মুখে আর একজন খাদ্য তুলিয়া দিতেন, এবম্প্রকার অনেক বিধ আমোদ ছিল। সে বড় এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। মানাপমান গৌরব অহঙ্কার কিছু নাই, যেন এক পাগলের মেলা। পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র ভাই ভগিনীরাও পরস্পরকে এত ভাল বাসিতে পারে না। সভ্যতার কুটিল গাম্ভীর্য্য, হৃদয়হীন ভদ্রতার শীতল ব্যবহার তখন ছিল না। উদার সরলচিত্ত বৈরাগীদল দিবা নিশি কেবল প্রেম ভক্তিতে সাঁতার খেলিতেন।

গৌরচন্দ্র ভক্তবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া নিরবধি এইরূপে হরিনামরসে নিমগ্ন রহিলেন। নিতাই শ্রীবাসের ঘরে থাকিতেন। তাঁহার গৃহিণী মালিনী দেবী মাতার ন্যায় এই শিশু তুল্য অবধূতকে অন্ন খাওয়াইয়া দিতেন। এক দিন গৌরাঙ্গ শ্রীবাসকে বলিলেন, "পণ্ডিত, এই সন্ন্যাসীকে

কেন তুমি ঘরে রাখিয়াছ? ইহার জাতি কুল জান না, উদারচরিত্র তুমি, তাই ইহাকে রাখিয়াছ। যদি জাতি কুল বাঁচাইতে চাও তবে শীঘ্র এই অবধূতকে বিদায় কর।” শ্রীবাস হাসিয়া বলিলেন “ঠাকুর, কেন আর আমাকে পরীক্ষা করেন? যে তোমার লোক সে যদি আমার জাতি কুল নাশ করে, তাহাতে কি আমার ভাবের অন্যথা হইবে?” ইহা শুনিয়া গৌরাঙ্গ আহ্লাদে হুঙ্কার শব্দ করত শ্রীবাসের বুকে চড়িয়া বসিলেন, এবং বলিলেন, কি বলিলি! তোর এত বিশ্বাস? তোর বাড়ীর বিড়াল কুকুর পর্য্যন্ত ভক্ত হইয়া যাউক এই আমার আশীর্ব্বাদ! গৌরের জাত্যভিমানও ছিল না, আবার ম্লেচ্ছের ন্যায় ভদ্রাভদ্র সকল জাতির সঙ্গে আহার ব্যবহার করা যে একটা অতি মহৎ কার্য্য ইহা দেখাইয়া গৌরব করাও তাঁহার ছিল না, এ সম্বন্ধে তিনি বেশ স্বাভাবিক সাত্বিকতা প্রকাশ করিতেন। কিন্তু তাঁহার হিন্দুর ন্যায় শুদ্ধ আচার ব্যবহার ছিল।

নিত্যানন্দ নন্দদুলালের মত নবদ্বীপের ঘরে ঘরে বেড়ান, গঙ্গায় সাঁতার দেন, কুমীর ধরিতে যান, ছেলেদের সঙ্গে ছেলে হইয়া খেলা করেন, শচীর নিকট খাবার চাহিয়া খান, শুকদেব গোস্বামীর ন্যায় বাল্যভাবে তিনি এই রূপে বিবিধ লীলা করিতে লাগিলেন। চৈতন্য এক দিন তাঁহাকে নিজালয়ে ভিক্ষার নিমন্ত্রণ করিয়া বলিলেন, দেখো ভাই! যেন চঞ্চলতা প্রকাশ করিও না। নিতাই বলিলেন তুমি কি আপনার মত সকলকেই মনে কর না কি? হাসিতে হাসিতে দুই ভ্রাতায় একত্র ভোজন করিলেন। শচী মাতা হরিভক্তগণের নিত্য নূতন কীর্ত্তি দেখিয়া নিজেও ভক্তিরসে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এই সময় ভাবুক বৈষ্ণবগণের মুখে অনেক অদ্ভুত কথা শ্রুতিগোচর হইত। কেহ বলিতেন আমি মহাপ্রভুকে ষড়্‌ভুজ হইতে দেখিয়াছি, কেহ বা অন্য প্রকার অলৌকিক ভাব বর্ণন করিতেন। যখন যাহার মনে যে ভাব প্রবল হইয়া উঠিত, তিনি তখন বাহিরেও তাহা অবলোকন করিতেন। কিন্তু স্বভাবের বিপরীতে কোন ঘটনা না ঘটিলেও তৎকালে অনেক অলৌকিক দৈবক্রিয়া দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। পাষাণ সমান হৃদয় ভক্তিরসে গলিয়া যায় ইহাঁ অপেক্ষা অলৌকিক ঘটনা আর কি হইতে পারে? চৈতন্যের যে ভক্তির আবেশ, প্রেমের উচ্ছ্বাস তাহা ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তি অপেক্ষা অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই।

নিশীথকালে সঙ্কীর্ত্তন।

এক দিন গৌরাঙ্গ বলিলেন, রাত্রি কেন বৃথা গত হয়, আজি হইতে এস আমরা নিশাকালে হরিসঙ্কীর্ত্তন করিব, সকলে শুনিয়া উদ্ধার হইবে; তোমাদের জীবনত এই জন্যই, অতএব আয়োজন কর। বৈষ্ণবগণ প্রস্তাব শুনিয়া উল্লসিত হইলেন। এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু প্রকাশ্যরূপে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। কোন দিন শ্রীবাসের গৃহে, কোন দিন বা চন্দ্রশেখরের ভবনে কীর্ত্তন হইতে লাগিল। গৌর নিতাই অদ্বৈত ব্যতীত বিদ্যানিধি, হরিদাস, মুরারি, গদাধর, হিরণ্য, গঙ্গাদাস, বনমালী, বিজয়, নন্দন, জগদানন্দ, বুদ্ধিমন্ত খাঁ, নারায়ণ, কাশীশ্বর, বাসুদেব, রাম, গরুড়াই, গোবিন্দ, গোবিন্দানন্দ, গোপীনাথ, জগদীশ, শ্রীমান্, শ্রীধর, সদাশিব, বক্রেশ্বর, শ্রীগর্ভ, শুক্লাম্বর, ব্রহ্মানন্দ, পুরুষোত্তম, সঞ্জয়াদি অনেক গুলি ভক্ত সঙ্কীর্ত্তনে মাতিলেন। ইহাঁরা প্রত্যেকেই জলন্ত অগ্নির ন্যায় জীবন্ত মনুষ্য। কাহারো নৃত্য গীতে বা সমাগমে অন্যের উৎসাহ অগ্নি নির্ব্বাণ হইত না, বরং এক একটি অগ্নিশিখা একত্র করিলে যেরূপ প্রবল উজ্জ্বল অগ্নিশিখা সমুৎপন্ন হয় ইহাঁদের মিলনে তাহাই হইত। মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ করতালের সহিত এই সময়ে প্রকৃত প্রস্তাবে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। তিন চারি দলে বিভক্ত হইয়া ভক্তগণ গান করিতেন। কখন কখন গৌরাঙ্গের নিজভবনেও এইরূপ কীর্ত্তন হইতে লাগিল। মহাপ্রভু আমের আঁঠি পুঁতিয়া তৎক্ষণাৎ এক গাছ উৎপন্ন করিয়া তাহাতে ফল ধরাইয়াছেন। অত্যন্ত সুমিষ্ট সে আম, খোঁসা আঁঠি কিছু নাই, খাইলে শরীর ঠাণ্ডা হইয়া যায়, এইরূপ কথা গৌরভক্তগণ তখন বলিয়া বেড়াইতেন। ইহার অর্থ বোধ হয়, "নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতং। পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥" কীর্ত্তনে উন্মত্ত হইয়া চৈতন্য যে কত রঙ্গ করিতেন তাহা আর বলা যায় না। এক একটি বিভিন্ন ভাবেতে তাঁহার শরীরের অবস্থা ভিন্ন ভাব ধারণ করিত। তেজস্বী যুবা পুরুষ, হুম্ দাম্ করিয়া ভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়িতেন, বীরদর্পে মাটি কাঁপাইয়া দিতেন। কাহার সাধ্য সে অবস্থায় তাঁহাকে ধরিয়া রাখে? তাঁহার অঙ্গের এই

আঘাত শচীমায়ের বুকে গিয়া যেন বজ্রসমান বাজিত! এইরূপে সমস্ত রাত্রি প্রায় শ্রীবাসের গৃহে নৃত্য গীত হইতে লাগিল। প্রমত্ত ভক্তবৃন্দের মধ্যে মত্ত মাতঙ্গ গৌরমণি কখন নাচেন, কখন মূর্চ্ছিত হইয়া মৃতবৎ পড়িয়া থাকেন; কাণের কাছে মহা শব্দে হরিবোল বলিলে তবে তাঁহার চৈতন্যোদয় হইত। তাঁহার শরীর কখন শীতল, কখন উষ্ণ, কখন শীতে কম্পিত, কখন উত্তাপে ঘর্ম্মাক্ত। এক একবার গভীর রবে হুঙ্কার করিয়া লম্ফ দিতেন, পর ক্ষণে আবার ধ্যানে মগ্ন হইয়া বসিয়া থাকিতেন; কখন মহা চীৎকার স্বরে গান ধরিতেন, কখন দন্তে তৃণ লইয়া দাস্যভাবে ভক্তগণের পদতলে পড়িতেন। যাহার পায়ে ধরিতেন, পরক্ষণে আবার তাহারই স্কন্ধে চড়িয়া বসিতেন। কখন চক্রাকারে নাচিতেন, অন্যের গলা ধরিয়া কাঁদিতেন। কখন থল্ থল্ করিয়া ক্রমাগত হাসিতেন। ভাবে বিভোর হইয়া কখন বালকের ন্যায় মুখে বাদ্য বাজান, কখন নিত্যানন্দের অঙ্গে হেলান দিয়া বসেন, কখন বা হামাগুড়ি দিয়া হাঁটেন। সেই প্রেমোন্মাদের অবস্থায় অরুণ নয়ন বিস্তার করিয়া যাঁহার পানে তিনি চাহিতেন তাহার মনে ত্রাস উপস্থিত হইত। ঘোর মদ্যপায়ীর ন্যায় উন্মত্ত ভাব। ভক্তগণ কখন কখন তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া নাচিতেন এবং গান করিতেন। ফলে ভাগবতোক্ত ভক্তির লক্ষণ যাহা কেবল লোকে কর্ণে শুনিয়াছিল, তৎসমুদায় লক্ষণ গৌরাঙ্গ নিজ জীবনে দেখাইতে লাগিলেন। কীর্ত্তনের সময় বাহিরের দরজা বন্ধ থাকিত। ভক্তদিগের আকাশভেদী হরিধ্বনি শ্রবণে চারিদিক্ হইতে নানা ভাবের লোক সকল দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া মহা গোলযোগ করিত। ভিতরে প্রমত্ত চিত্ত ভক্তগণ আপনাদের ভাবে মগ্ন হইয়া মনের সাধে সঙ্কীর্ত্তন করেন, বাহিরে পাষণ্ডগণ দ্বার খোলা না পাইয়া নিন্দা করিয়া বলে, ইহারা লুকাইয়া মদ খায় এবং ব্যভিচার করে। তাহারা ভিতরে প্রবেশ করিতে চায়, পারে না, মহা বিরক্ত হইয়া নানা কথা বলে। দ্বার বন্ধ থাকাতে দর্শকদিগের কৌতুহল এবং ক্রোধ বাড়িতে লাগিল। কেহ বলে, ভাই নিমাই পণ্ডিতটে এমন বুদ্ধিমান্ ছিল, কেবল সঙ্গদোষে মারা গেল। আহা! একে বাপ নাই, তাহাতে আবার বায়ুরোগ, পড়া শুনা ছাড়িয়া এখন ইহাদের দলে মিশিয়া গিয়াছে। কেহ বলে শ্রীবাস বামনই যত নষ্টের গোড়া। ইহাদের মুখ দেখিলে পাপ হয়। নিত্যকর্ম্ম

ছাড়িয়া যার তার সঙ্গে ইহারা একত্র ভোজন করে, মদ এবং পঞ্চ কন্যা আনিয়া গোপনে দুষ্কর্ম্ম করে, কল্য সকলকে ধরিয়া ধরিয়া বাঁধিব। এ দেশে কীর্ত্তন কখন ছিল না, ইহা আনিয়া হতভাগ্যেরা দেশের মধ্যে দুর্ভিক্ষের আগুন জ্বালাইয়া দিল। ধান্য জন্মে না, টাকাকড়ি উপার্জ্জন হয় না, আবার কোথা হইতে একটা অবধূত আসিয়া জুটিয়াছে। নিরঞ্জন দেহের মধ্যে আছেন, ইহারা বাহিরে ডাকিয়া বেড়ায় কেন? দলের ভিতর কেহ কেহ আবার ভাল মানুষও আছে। তাহারা বলে, কাজ কি ভাই পরের নিন্দায়? চল আমরা ঘরে যাই, নিজ কর্ম্মদোষে আমরা দেখিতে পাইলাম না, ওঁদের কি দোষ? অপর পাঁচ জন নিন্দুক এক হইয়া আবার ইহাদিগকে মারিতে যাইত, এবং গালাগালি দিয়া বলিত, ভারিত কীর্ত্তন! যেন শত শত লোকে দ্বন্দ্ব আরম্ভ করিয়াছে! জপ তপ তত্ত্বজ্ঞান কর্ম্মকাণ্ড লোপ হইল, ইহারা চাল কলা মুগ দধি একত্র মাখিয়া সকলে মিলে খায়। এত সব ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত থাকিতে এ ডাকাইত গুলাকে কেহ কি জব্দ করিতে পারিল না? এইরূপে তাহারা সকলে উপহাস নিন্দা করিয়া যায়, ভাবাবিষ্ট ভক্তেরা এ সব কথা শুনিয়াও শুনেন না। এক দিন এক ক্রোধী ব্রাহ্মণ নিমাইকে গঙ্গাস্নানের পথে পাইয়া পৈতা ছিঁড়িয়া শাপ দিয়া বলিয়াছিল, "তুমি আমাকে কীর্ত্তন শুনিবার জন্য ভিতরে যাইতে দাও নাই, তোমায় যেন কখন সংসারে থাকিতে আর না হয়!" এই শাপ চৈতন্যের পক্ষে বর হইল, তিনি হাস্য করিলেন। দেখিতে দেখিতে কোথা দিয়া রাত্রি দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। এক দিন নিশাবসানে কীর্ত্তন ভঙ্গ করিয়া চৈতন্যদেব শ্রীবাসের শালগ্রাম শিলা ঠাকুর বিগ্রহ মূর্ত্তি যাহা কিছু ছিল সবগুলি কোঁচড়ে লইয়া খাটের উপর বসিয়া বলিলেন, কি আছে আমাকে খাইতে দাও। চালভাজা মুড়ি দৈ নারিকেল কলা চিনি ক্ষীর ছানা ননী কতকগুল একবারে খাইয়া ফেলিলেন, ভক্তগণ এক এক জন এক একটি সামগ্রী আদর করিয়া দিতে লাগিলেন, নিতাই তাঁহার মাথায় ছাতা ধরিলেন। আহারান্তে কত ক্ষণ পরে ভাবরসে চৈতন্য এমনই অজ্ঞান হইলেন, বোধ হইল যেন ধাতু নাই। ভক্তগণ কাঁদিয়া আকুল হইল, পরে আবার চেতনা লাভ করিয়া তিনি সকলকে সুখী করেন। সঙ্কীর্ত্তনই ইহাদের সাধন, ভজন, সঙ্কীর্ত্তনই যোগ তপস্যা ধ্যান আরাধনা ছিল। ইহা দ্বারা পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃসৌহৃদ্য বৃদ্ধি হইত।

গৌরাঙ্গের দরবার।

এক দিন প্রাতে গৌর নিতাই দুই জনে শ্রীবাসের ভবনে উপস্থিত হইলেন, তাঁহাদের ভাব বুঝিয়া আর আর ভক্তগণ সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, মহানন্দে সকলের চিত্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে দিন সাত প্রহর কাল ক্রমাগত আনন্দোৎসব হয়। ভক্তগণ চৈতন্যকে স্নান করাইয়া, পুষ্পমালা এবং চন্দনে সজ্জিত করিলেন; নানাবিধ উপাদেয় সামগ্রী সকল ভোজন করাইয়া বহু আদরে তাঁহার সেবা করিলেন। সমস্ত দিন পান ভোজন, নৃত্য গীত, আহ্লাদ আমোদে গত হইল, সন্ধ্যাকালে পুনরায় হরিনামরসে সকলে মাতিয়া উঠিলেন। আনন্দ উৎসবের সময় পরমাত্মীয় বন্ধুদিগকে স্বভাবতঃই মনে পড়ে। থোড়বিক্রেতা সুদরিদ্র শ্রীধরকে দেখিবার জন্য সে দিন চৈতন্যের বড় অভিলাষ হইল। শ্রীধর এক জন গরিব ব্রাহ্মণ। থোড় কলাপাত খোলা তরকারী বিক্রয় করিয়া তিনি দিনপাত করিতেন, আর হরিনাম ও ভক্তিরসে মগ্ন থাকিতেন। পূর্ব্বে চৈতন্য তরকারী ক্রয় করিতে গিয়া শ্রীধরের সঙ্গে অনেক কৌতুক ও বিবাদ করিতেন। দরিদ্র বিপ্রের তরকারী কলাপাত তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। শ্রীধর শুদ্ধসত্ব লোক, এক কথা ভিন্ন দুই কথা বলিতেন না। খোলাবেচা শ্রীধর ইহাঁর নাম। ব্যবসায়ে যাহা কিছু পাইতেন তাহা দ্বারা পবিত্রভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ইহাঁকে রাত্রিকালে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে দেখিয়া বিরোধিগণ বলিত, এ ব্যাটা খোলাবেচা বামুন আবার করে কি! বুঝি ভাতে পেট ভরে না, তাই ক্ষুধার জ্বালায় রাত্রে চীৎকার করিয়া মরে। পরণে বস্ত্র নাই, পেটে অন্ন নাই, ইহাঁর আবার রঙ্গ দেখ! দুঃখীর বন্ধু গৌরচন্দ্র শ্রীধরকে ডাকিয়া আনিলেন, এবং তাঁহাকে লইয়া উৎসবে মত্ত হইলেন। অনাথ পাপী সরলহৃদয় ব্যক্তিদিগকে পাইলে গৌরের বড় আহ্লাদ হইত। নিতান্ত অমায়িক উদার স্বভাব ছিল, যাকে তাকে আলিঙ্গন দিতেন, প্রসন্ন হইয়া যার তার সঙ্গে কথা কহিতেন, অজ্ঞান গরিব অপরিচিত ব্যক্তিরা তাঁহার নিকট সমাদর লাভ করিয়া কৃতার্থ হইত। তাঁহার প্রেমরসসিক্ত কোমল অঙ্গস্পর্শে

অপ্রেমিক কঠোর হৃদয় ব্যক্তির মুখ দিয়া ভক্তিভাবপূর্ণ গভীর তত্ত্বকথা আপনাপনি বাহির হইয়া পড়িত। গৌরাঙ্গ জড়প্রায় মৃত মোহাসক্ত ব্যক্তিদিগের হৃদয়েও প্রেমভক্তি সংক্রামিত করিতে পারিতেন। যাহার সঙ্গে তিনি কথা কহিতেন সে নবজীবন পাইত, এবং উৎসাহী হইয়া ভক্তিরসে উন্মত্ত হইত। তাঁহাকে দেখিলে, তাঁহার কথা শুনিলে কেহ আর অলসের ন্যায় থাকিতে পারিত না। অগ্নির সহবাসে যেমন দেহ উত্তপ্ত হয়, তাঁহার সহবাসে তেমনি মন সহজে উত্তপ্ত হইয়া উঠিত। শ্রীধর ব্রাহ্মণকে ভক্তদলের মধ্যে আর বড় একটা কেহ চিনিতেন না, তাঁহার ভক্তি অনুরাগ নিষ্ঠা এবং সৎস্বভাব দেখিয়া তাঁহারা সকলে অবাক্ হইয়া গেলেন।

এই সপ্ত প্রহরিয়া মহোৎসব গৌরাঙ্গের একটি প্রকাশ্য দরবার বিশেষ। সে দিন তিনি এক এক করিয়া সকলকেই আশীর্ব্বাদ করেন এবং প্রত্যেকের নাম ধরিয়া আলাপ করেন। যবন হরিদাসকে ডাকিয়া বলিলেন, হরিদাস! তুমি আমার দেহ হইতে বড়। তোমাকে দুষ্ট যবনেরা বাজারে বাজারে প্রহার করিয়াছে তাহা স্মরণ করিলে আমার বুক বিদীর্ণ হয়। এত নির্য্যাতনেও তুমি তাহাদিগকে ভালবাসা দেখাইয়াছ, ধন্য তোমার জীবন! হরিদাস মহাপ্রভুর শ্রীমুখবিনিঃসৃত সুধাময় বাক্য সকল শুনিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন এবং নানামতে তাঁহাকে স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন। বলিলেন ঠাকুর! আমি যেন আপনার দাসানুদাস হইয়া ভক্তের পত্রাবশিষ্টপ্রসাদভক্ষণে প্রাণ ধারণ করিতে পারি। অতি হীন যবন আমি, আমার প্রতি আপনার এত দয়া! উচ্চ শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণমণ্ডলীমধ্যে আদৃত হইয়াছেন বলিয়া যে হরিদাস সকলের ঘাড়ে চড়িয়া লাথি মারিয়া ফিরিবেন, সেরূপ নীচ প্রকৃতির লোক তিনি ছিলেন না। অদ্বৈত গোস্বামী পিতৃশ্রাদ্ধের উপহার শ্রাদ্ধপাত্র হরিদাসকে খাইতে দিতেন। শুদ্ধাচারী ব্রতনিষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাহাকে ইহা দিলে পিতৃপুরুষ নরকস্থ হয়, কিন্তু হরিদাস সে উচ্চ অধিকার পাইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণভক্তেরা তাঁহাকে যত উপরে তুলিতে চেষ্টা করিতেন, তিনি স্বীয় বিনয় গুণে ততই নীচে নামিতে ভাল বাসিতেন, সুতরাং উচ্চাসন তাঁহারই প্রাপ্য হইল। যবনের প্রতি গৌরাঙ্গের এরূপ প্রসন্নতা এবং অনুরাগ দেখিয়া ভক্তমণ্ডলীতে জয়ধ্বনি পড়িয়া গেল। ভক্তি জাতিনির্ব্বিশেষে সকল মনুষ্যের হৃদয়ে বিরাজ করে

তাহা স্বীকার করাতে সভাস্থ সকলের জাত্যভিমান দূর হইল। কিন্তু অপর ব্রাহ্মণেরা এ কথা শুনিয়া বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রতি এবং চৈতন্যের উপর অত্যন্ত চটিয়া যায়।

মহাপ্রভু সে দিন সকলের সঙ্গে কথা কহিলেন, কেবল গায়ক মুকুন্দকে ডাকিলেন না। তন্নিমিত্ত শ্রীবাসাদি দুঃখিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসু হইলে তিনি বলিলেন, মুকুন্দের ভক্তির উপর একান্ত আস্থা নাই, সে যেখানে যেমন সেখানে তেমন কথা বলে, ভক্তি অপেক্ষা অন্য কিছু বড় আছে যাহারা মনে করে তাহাদের অপরাধ হয়। এ কথা শুনিয়া মুকুন্দ বিষাদিত অন্তঃকরণে কাঁদিতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভর তখন হাসিয়া বলিলেন, তুমি কোটি জন্মের পর প্রভুর দর্শন পাইবে। ইহা শুনিয়া মুকুন্দের আনন্দের আর সীমা রহিল না। দর্শন পাইবত! ইহাতেই কত আশা আনন্দ বৃদ্ধি হইল। তখন চৈতন্য সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, আমার কথায় তোমার এত বিশ্বাস? তোমার আশা পূর্ণ হউক! চির দিনের জন্য তুমি আমার হইলে, আমার গায়ক হইয়া তুমি সঙ্গে সঙ্গে চিরকাল বাস কর। এইরূপে সকলের সহিত আলাপ সম্ভাষণ আহ্লাদ আমোদ সঙ্কীর্ত্তন করিয়া ভক্তগণ সে দিন-কার উৎসব শেষ করেন। পরস্পরের মধ্যে প্রাণের টান ক্রমশঃ এমনি বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, এক দিন কেহ কাহারো মুখ না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না। সকলেরই উদার উন্মুক্ত হৃদয়, কোন প্রকার লুকোচুরি স্বার্থ-পরতা কপটভাব কাহারো ছিল না। আজ্ঞা, আপনি, এ প্রকার শ্রুতিমধুর রসহীন মিষ্ট লৌকিক ব্যবহার তাঁহারা জানিতেন না। হরিরস মদিরা পানে অন্তর বাহির একাকার হইয়া যাইত, সুতরাং ভয়মূলক সম্ভ্রম শ্রদ্ধা স্থান পাইত না, অথচ পরস্পরের প্রতি ভক্তি ভালবাসা যথেষ্ট ছিল। এক জন অন্যের কিঞ্চিৎ সেবা করিতে পারিলে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করি-তেন।

ভক্ত বৈষ্ণবদিগের এইরূপ বিশ্বাস ছিল, যে ভগবান্ বৈকুণ্ঠে নিত্যসিদ্ধ পুরুষদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া নানা রূপ পরিগ্রহ করত সকলে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শাস্ত্রে কথিত আছে কলিযুগে নামমাহাত্ম্য প্রচারিত হইবে, তাহারই জন্য ইহাঁরা স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। চৈতন্য স্বয়ং ভগবান্, নিতাই বলরাম, অদ্বৈত মহাদেব, শ্রীবাস নারদ ঋষি, হরিদাস ব্রহ্মা, এইরূপে ইহাঁরা এক এক জন এক একটি দেবতার অবতার হইয়া লীলার

সাহায্য করিতে আসিয়াছেন। ইহাঁদের জন্ম মৃত্যু নাই, ভূভারহরণের জন্য ভগবান্ যখন যখন অবতার হন তখন ইহাঁরা যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। বাস্তবিক মনুষ্যজীবনে ভগবানের লীলা অতীব মনোহর দৃশ্য। তাঁহার বিশেষ কৃপাবলে এক নবীন ভক্তবংশ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে এবং তাহারা হরিভক্তিরসে অভিষিক্ত হইয়া যুগধর্ম্মের জয়নিশান উড়ায়, বিধানের জয়ভেরী বাজায়, তদ্দ্বারা মুক্তির পথ পরিষ্কার হইয়া যায়। ভক্তির ধর্ম্ম পালন ও প্রচারের জন্য যে তাঁহাদের জন্ম তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভগবানের মঙ্গলময়ী পালনী ব্যবস্থাই ইহার মূল। তাঁহার ইচ্ছাতে যুগে যুগে এইরূপে কত শত সাধু জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

কে কোথা হইতে আসিয়া নবদ্বীপধামে এই ভক্তসমাজ গঠন করিলেন তাহা ভাবিয়া দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করা যে ঈশ্বরের অভিপ্রায় তাহা এ সকল যোগাযোগ শুভ সংঘটন এবং সম্মিলন দেখিলে বাস্তবিকই বিশ্বাস হয়। ইহা যে তাঁহার পরিত্রাণদায়িনী ব্যবস্থার অন্তর্গত একটি বিধান তাহাতে আর সংশয় নাই। এক এক করিয়া নানা স্থান হইতে ভক্তগণ একত্রিত হইয়া অতি সুন্দর একটি দল গঠন করিলেন।

সপ্ত প্রহরিয়া উৎসবের পর হইতে নিত্যানন্দের প্রেমত্ততা কিছু বৃদ্ধি হইল। তিনি কখন কখন উলঙ্গ হইয়া বিমনা হইতেন। এক দিন বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে চৈতন্য গৃহে বসিয়া আছেন এমন সময় নিতাই বিবস্ত্র হইয়া তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। অনেক সময় চৈতন্য নিজে তাঁহাকে কাপড় পরাইয়া দিতেন, এবং শান্ত শিষ্ট সভ্য ভব্য হইয়া থাকিতে বলিতেন। অবধূতকে তিনি যথেষ্ট সম্মান করিতেন। এক দিন সকলকে বলিলেন, তোমরা নিত্যানন্দের পাদোদক পান কর। ইহাঁকে ভক্তি না করিলে আমাকে অপমান করা হয়, এবং ইহাঁকে যাহারা ভালবাসে ভক্তি করে, তাহারাই আমাকে প্রকৃতরূপে ভক্তি করে ভাল বাসে। নিত্যানন্দের এক খণ্ড কৌপীন লইয়া তাহা ছিন্ন করিয়া এক এক খণ্ড সকল ভক্তকে তিনি দিলেন, এবং বলিলেন ইহা মস্তকে বাঁধিয়া রাখ। আর সকলে গৃহী, কেবল নিতাই তখন এক মাত্র উদাসীন যোগী ছিলেন; বৈরাগ্য উদ্দীপনের জন্য বোধ হয় তাঁহার কৌপীন বিভাগ করিয়া মস্তকে ধারণ করা হইল। ভক্তদলের মধ্যে যাহার যে বিষয়ে বিশেষ অনুরাগ এবং উচ্চ ভাব ছিল, গৌর তাহার প্রশংসা

করিতেন, তজ্জন্য তাঁহাকে মান্য করিতেন। সম্মুখে প্রশংসা করিলে কাহারো ক্ষতি হইবে কি না তাহা ভাবিবারও তখন সময় হয় নাই। মাতামাতি ঢলাঢলির ধর্ম্ম কি না, এ সব বৈজ্ঞানিক চিন্তা কাহাকেও নির্ব্বাক্ গম্ভীর করিয়া রাখিতে পারিত না। মন খুলিয়া গেলে মাতালেরা যেরূপ পরস্পরের গুণগান করে, সেইরূপ ইঁহাদের অবস্থা ছিল। ফলে ভাবুক লোকদিগের সম্বন্ধে এরূপ ব্যবহার স্বাভাবিক, আপনাপনি ভিতরকার কথা বাহির হইয়া পড়ে; তাহারা সভ্যতার শাসন, ভদ্রতার নিয়ম মানে না। বিশেষতঃ তখন সামাজিক প্রথা ব্যবহারপ্রণালী কবিত্ব এবং ভাবুকতার অনুকূলেই ছিল। একে কবিত্বপ্রধান সময় তাহার উপর প্রগল্‌ভা ভক্তির প্লাবন, এইজন্য তৎকালে অনেক কঠোরহৃদয় বিষয়ী ব্যক্তিও কবি হইয়া উঠিয়াছিলেন। লৌকিক ব্যবহার, ভাষা, সমুদায় রীতি নীতি কবিত্বরসে পূর্ণ ছিল। বৈষ্ণবদিগের রচিত রাশি রাশি গ্রন্থ ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। রূপ, সনাতন, কবিকর্ণপুর ইহাঁরা উৎকৃষ্ট কবি ছিলেন। চৈতন্যলীলার আদ্যোপান্তে কবিত্বেরই আধিক্য দৃষ্টিগোচর হয়।

যে পরিমাণে ভক্তি ও ভক্তদলের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল, বিদ্বেষী শাক্ত হিন্দু ও ধর্ম্মব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মৎসরতা জিগীষাও সেই পরিমাণে প্রকাশ হইয়া পড়িল। চাপাল গোপাল নামক এক জন ভ্রষ্টাচারী ব্রাহ্মণ ছিল। যেখানে সঙ্কীর্ত্তন হইত সেই শ্রীবাসের গৃহদ্বারে একদা রজনীযোগে সে জবাফুল, মদ্যভাণ্ড, সিন্দূর রক্ত চন্দন প্রভৃতি বামাচারীদিগের পূজার সামগ্রী রাখিয়া গিয়াছিল। পর দিন সে সকল দ্রব্য দেখিয়া বৈষ্ণবেরা আমোদ করিতে লাগিলেন। কথিত আছে, সেই অপরাধে এই ব্রাহ্মণ শেষ কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হয় এবং বহুদিন পরে চৈতন্যের প্রসন্নতা লাভ করে।

এক দিন গৌরসিংহ অনুরাগে মগ্ন হইয়া ভক্তসঙ্গে বিরাজ করিতে করিতে হঠাৎ হরিদাস এবং নিতাইকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমরা অদ্য হইতে নবদ্বীপের প্রতি ঘরে ঘরে হরিনাম ঘোষণা কর। প্রত্যেক ব্যক্তিকে বল যে, আমাদের এই ভিক্ষা, তোমরা সকলে হরি বল। ইহা ভিন্ন আর কোন কথা বলিবে না এবং শুনিবে না। দিবাবসানে আমাকে আসিয়া সংবাদ দিবে।" এ কথা শুনিয়া ভক্তগণ আহ্লাদের সহিত হরিবোল দিয়া উঠিলেন। হরিদাস ও নিতাই যে আজ্ঞা বলিয়া তদ্দণ্ডে হরিনাম প্রচারার্থ বহির্গত হইলেন এবং দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া নদীয়াবাসীদিগকে

বলিতে লাগিলেন, "তোমরা হরি বল, হরিনাম গাও, হরিকে ভজ, তিনি প্রাণ ধন জীবন, অতএব ভাই তোমরা এক মন হইয়া হরিভজনা কর, এই আমাদের ভিক্ষা। ব্যাকুলভাবে আস্তে ব্যস্তে আসিয়া এই কথা বলিয়া তাঁহারা চলিয়া যান। যাহারা সুজন তাহারা সুখী এবং আর্দ্র হয়, কেহ সন্তুষ্ট হইয়া বলে আচ্ছা আচ্ছা করিব। কেহ বা নিন্দাও করে। যাহারা শ্রীবাসের দ্বারে প্রবেশ করিতে না পারিয়া ক্রুদ্ধ মনে ফিরিয়া আসিয়াছিল তাহারা বলিতে লাগিল, তোমরা সঙ্গদোষে পাগল হইয়াছ বলিয়া আমাদিগকেও পাগল হইতে বল না কি? নিমাই পণ্ডিতটে সকলকেই নষ্ট করিল। কেহ বলে এ ব্যাটারা চোর, চুরি করিবার জন্য ছদ্মবেশ ধরিয়াছে, তাহা না হইলে এমন করে কেন? পুনরায় যদি আসে ধরিয়া রাজদ্বারে চালান করিব। এ সব কথা শুনিয়া হরিদাস নিতাই দুই জনে মনে মনে হাসেন; গৌরাঙ্গের শিষ্য, কিছুতেই ভয় নাই, নাম প্রচার করিয়া প্রতিদিন গুরুদেবকে গিয়া সংবাদ দেন। এ দেশে হিন্দুধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচারের ভাব কোন কালে ছিল না, একা একা নির্জ্জনে বসিয়া সাধন ভজন করিয়া নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করা হিন্দুধর্ম্মের চরম লক্ষ্য। বুদ্ধদিগের ধর্ম্ম প্রচারের ধর্ম্ম ছিল, অপর ধর্ম্মিদিগকে তাঁহারা অভিষেক করিতেন। তদনন্তর চৈতন্য প্রচারের ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিলেন। ভ্রাতৃপ্রেমে সম্বদ্ধ হইয়া একত্র সাধন ভজন করা এ ভাব চৈতন্য মহাপ্রভু দিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মপ্রচার এবং সামাজিক সাধন এই দুইটি নূতন ভাব তাঁহার হৃদিস্থিত ভক্তির ধর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী ফল, স্বভাবতঃ আপনা হইতেই তাহা বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। ভক্তির ধর্ম্ম যে স্বাভাবিক এবং মানব-প্রকৃতিসম্ভূত ধর্ম্ম তাহা ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে।

জগাই মাধাই।

এক দিন নিতাই ও হরিদাস প্রচার করিতে বাহির হইয়া দেখিলেন, পথের মধ্যে দুই প্রকাণ্ড মাতাল, ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটির সহিত বিচরণ করিতেছে। তাহারা আর কেহ নহে, প্রসিদ্ধ দুরাচারী জগাই মাধাই। ইহাদের মত পাষণ্ড আর তখন কেহ ছিল না। জগাই মাধাই ব্রাহ্মণের ছেলে, ইহাদের পিতা পিতামহ ভদ্র এবং সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন; কিন্তু ইহারা দুই ভাই বালক-কাল হইতে মদ্য পান করিতে অভ্যাস করে। যৌবনকালে এমনি দুর্দ্ধর্ষ ঘোর পাষণ্ড হইয়া উঠিল যে, কাহার সাধ্য তাহাদের নিকটে যায়, যেন পিশাচের মত ব্যবহার। গোমাংসের সঙ্গে সুরাপান করিত, লোকের ঘরে সিঁদ দিত, আগুন লাগাইত, বন্য মহিষের ন্যায় পথের মাঝে দুই জনে পরস্পর মারামারি গালাগালি করিত, তাহাদের ভয়ে লোকে অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। যেখানে সেখানে দুই জনে গোলযোগ করিয়া বেড়াইত। সম্মুখে কাহাকে পাইলে হয়ত বিনামূল্যে দুইটা কিলই বসাইয়া দিত। নিতাই গৌর যেমন প্রেমে মত্ত, ইহারা দুই ভাই তেমনি সুরাপানে মত্ত। অভিভাবকেরা আঁটিতে না পারিয়া ইহাদিগকে একবারে ছাড়িয়া দিয়াছিল। এমন দুষ্কর্ম্ম নাই যাহা এই দুই জনে না করিয়াছে। জগাই মাধাই পাষণ্ডের দৃষ্টান্ত স্থল, এবং পাপী উদ্ধারেরও একটি আশ্চর্য্য উদাহরণ। পাপের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া শেষে মুক্তিলাভ করত ইহারা বঙ্গসমাজে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছে। জগাই মাধাইয়ের ঘোর দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া এবং স্বচক্ষে তাহাদের কুব্যবহার দেখিয়া পরপ্রেমী নিতাই বড় দুঃখিত হইলেন। ভাবিলেন, ইহাদের যদি মনের পরিবর্ত্তন হয় তবেইত চৈতন্যের দাস বলিয়া আমি পরিচয় দিতে পারি। এখন যেমন ইহারা সুরাপানে মত্ত হইয়া আছে তেমনি যদি হরিনামরসে মত্ত হয়; এবং এখন যাহারা ইহাদিগকে স্পর্শ করিয়া গঙ্গাস্নান করে, তাহারা যদি ইহাদিগকে কখন পবিত্র বোধে স্পর্শ করে, তবেই আমার হরিনাম প্রচার সার্থক। ফলতঃ ইহাদের উপর নিতাইয়ের অত্যন্ত দয়া হইল। বাস্তবিকও এমন দয়ার পাত্র নবদ্বীপে কেহ আর তখন ছিল কি না সন্দেহ। নিতাই হরিদাসকে বলিলেন,

হরিদাস! তুমি যবনহস্তে অশেষ যন্ত্রণা পাইয়াও তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলে, প্রভুকে বলিয়া যদি এই ভ্রষ্টপ্রকৃতি ব্রাহ্মণতনয়দ্বয়ের কিছু করিতে পার! পতিত নরাধমদিগকে উদ্ধার করাইত তাঁহার কার্য্য। হরিদাস বলিলেন ঠাকুর, কেন আর আমার মাথা খাও, তোমার যে ইচ্ছা প্রভুরও সেই ইচ্ছা। নিতাই বলিলেন চল তবে আমরা ঐ দুই জনের কাছে প্রভুর আদিষ্ট নাম প্রচার করি। সকলকেইত তিনি এ নাম শুনাইতে বলিয়াছেন, বিশেষতঃ মহাপাপীর প্রতি তাঁহার বিশেষ কৃপা। বলিবার ভার আমাদের আছে, আমরা বলিয়া যাই, তার পর তিনি যাহা জানেন করিবেন। এই বলিয়া দুই জনে জগাই মাধাইয়ের নিকট নাম প্রচার করিতে গেলেন। নিকটস্থ ভদ্র লোকেরা নিষেধ করিল যে, তোমরা উহাদের নিকটে গেলে এখনই প্রাণ হারাইবে, এই দেখ আমরা ভয়ে দূরে রহিয়াছি, সাবধান! নিকটে কদাপি গমন করিও না। নিতাই তাহা না শুনিয়া হরিদাসকে লইয়া তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং বলিলেন, তোমরা "বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণ নাম; তিনি মাতা তিনি পিতা তিনি ধন প্রাণ।" অনাচার ছাড়িয়া হে জগাই মাধাই! তোমরা হরিভজন কর। এ কথা শুনিয়া তাহারা ক্ষিপ্ত বৃষের ন্যায় আরক্ত নয়নে মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখিল, দুই জন সন্ন্যাসবেশধারী মনুষ্য নিকটে দণ্ডায়মান। দেখিবামাত্র ক্রোধভরে অমনি ধর! ধর! বলিয়া তাড়া করিল। নিত্যানন্দ হরিদাস প্রাণভয়ে দৌড়িতে লাগিলেন, তাহারাও গালি পাড়িতে পাড়িতে পশ্চাদ্ধাবিত হইল। ধরে আর কি! কোন রূপে সাধু দুই জন প্রাণ রক্ষা করিলেন। ভদ্র সজ্জনেরা বলিতে লাগিল, তখনই আমরা নিষেধ করিলাম উঁহাদের নিকট তোমরা অগ্রসর হইও না, এখন দেখ মহা সঙ্কটে পড়িলে। হায়! হায়! হায়! উঁহাদের হাতে পড়িলে কি কাহারো রক্ষা আছে? পাষণ্ডী বিদ্বেষীরা মনে মনে হাসে আর বলে, এইবার ভণ্ডদের উচিত শাস্তি হইয়াছে! ক্রমাগত দুই জন পাছে পাছে দৌড়িতে লাগিল। ধরি ধরি করে আর ধরিতে পারে না। প্রকাণ্ড স্থূলকায় দুই ষণ্ডা তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে চলিল। বলে তোরা আজ যাবি কোথা? জগা মাধা এখানে আছে তোরা জানিস্ না? নিত্যানন্দ মনে ভাবিলেন, আচ্ছা বৈষ্ণব করিতে গিয়াছিলাম, এখন প্রাণ রক্ষা হইলে বাঁচি! বৃদ্ধ হরিদাস দৌড়িতে পারেন না, ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, মহা বিপদ্ হইল, মাতালও পাছ ছাড়ে না। হরিদাস নিতাইকে বলিলেন,

তোমারই বুদ্ধিতে আজ অপমৃত্যুতে প্রাণটা গেল। মদ্যপায়ীকে হরিকথা শুনাইলে এই তাহার ফল হয়। যবনের হস্ত হইতে কৃষ্ণ রক্ষা করিলেন, এবার চঞ্চলবুদ্ধির সঙ্গে পড়িয়া মারা গেলাম। নিতাই হাসেন আর দৌড়ান। তিনি বলিলেন ও হে হরিদাস! আমি চঞ্চল নহি, ঠাকুরের আজ্ঞায় আমি ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করি। সে আজ্ঞা পালন না করিলেও সর্ব্বনাশ হয়, আবার করিলেও দেখ এই দশা ঘটে। তাঁহার দোষ তুমি দেখ না, কেবল আমাকেই দোষী করিতেছ। এইরূপে আমোদ ও বিবাদ করিতে করিতে দুই জনে চলিলেন, মাতালদ্বয়ও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। চৈতন্যের বাড়ীর নিকট গিয়া তাহারা পশ্চাতে পড়িয়া রহিল, আর তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইল না। অবশেষে আপনারা দুই জন পরস্পরে হুড়াহুড়ি কিলাকিলি আরম্ভ করিল। কোথায় তাহারা ছিল আর কোথায় আসিয়াছে কিছুই জ্ঞান নাই। ভক্তদ্বয় মাতালের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া সাধুবৃন্দপরিবেষ্টিত গৌরচন্দ্রের সমীপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নিকট এই ভয়ানক বিপদের কথা সমস্ত বর্ণন করিলেন। গঙ্গাদাস ও শ্রীবাস জগাই মাধাইয়ের দুরবস্থার কথা বিশেষ অবগত ছিলেন, তাঁহারা বিস্তারিতরূপে তাহা প্রভুকে জানাইলেন। গৌর বলিলেন তাহারা এখানে আসিলে আমি তাহাদের মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিব। নিতাই বলিলেন, তুমি তাহাদিগকে যাহাই কর, কিন্তু তাহারা দুই ভাই থাকিতে আমি আর কোথাও যাইব না। কিসের তোমার এত গৌরব? সেই দুই জনকে যদি তুমি উদ্ধার করিতে পার তবে বুঝি তোমার মহিমা। আমাকে উদ্ধার করিয়া যত তোমার মহিমা তাহা হইতে অধিক মহিমা প্রকাশ পাইবে যদি তুমি ইহাদিগকে ভাল করিতে পার। বিশ্বম্ভর হাসিয়া কহিলেন, নিতাই, তুমি যখন তাহাদের মঙ্গলচিন্তা করিতেছ তখন নিশ্চয় জানিবে, অচিরে কৃষ্ণ তাহাদের বন্ধন মোচন করিবেন। এ কথা শুনিয়া ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে হরিধ্বনি পড়িয়া গেল। হরিদাস অদ্বৈতের নিকট সে দিনের বিপদের কথা এবং নিত্যানন্দের চঞ্চলতার কথা সমুদায় বলিতে লাগিলেন। অদ্বৈত বলিলেন, মাতালেরা মাতালের সঙ্গে মিশিবে, তুমি নিষ্ঠাবান্ হইয়া সে জন্য এত ভীত হও কেন? দিন দুই পরে দেখিবে কি হয়। নিতাইকে আমি ভালরূপে জানি, সে সকলকে প্রেমে মাতোয়ালা করিবে।

তদনন্তর কিছু দিন পর্য্যন্ত জগাই মাধাই কখন গঙ্গাতীরে, কখন

চৈতন্যের বাড়ীর নিকটে ঘুরিয়া বেড়াইত। শেষ গৌর যে ঘাটে স্নান করিতেন সেই থানে উহারা আড্ডা করিল। ইহাদের ভয়ে একাকী রাত্রিকালে ঘাটে কেহ যাইতে সাহস করিত না। কিন্তু যদিও ইহারা দুই ভাই অতি ভয়ানক মাতাল, তথাপি মন তাহাদের বড় শাদা ছিল। তাহারা সরলভাবে অকপট মনে দুষ্কর্ম্ম করিয়া বেড়াইত, ভদ্রতা বা ধর্ম্মের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া কুটিল মন্ত্রণা এবং যুক্তি বিজ্ঞান কপট কৌশলের সাহায্যে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিত না, এই জন্য সহজে মুক্তি লাভ করিতে সক্ষম হয়। পরে চৈতন্য যেখানে কীর্ত্তন করিতেন তথায় গিয়া ইহারা সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কীর্ত্তন শুনিত। ভিতরে যাইবার সুযোগ পাইত না, বাহিরে থাকিয়া মৃদঙ্গ মন্দিরার সঙ্গে তালে তালে নাচিত, নানা রঙ্গ ভঙ্গ করিত। মদের সঙ্গে সঙ্গে গৌরের সঙ্কীর্ত্তন যেন তাহাদের চাটনী হইল। সেই থানে বসিয়া মদ্য পান করিত আর কীর্ত্তন শুনিয়া নাচিত। মদের নেশার সঙ্গে কাহারো কাহারো ধর্ম্মের ভাব হয়, এই জন্য অনেকে মাদকবিশেষকে সাধনের অঙ্গ এবং অনুকূল উপায় বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা নিতান্ত বিকৃত উপায়, আধ্যাত্মিক প্রেমের নেশাই এ পথের অনুকূল সহায়। নেশার সঙ্গে হরিসঙ্কীর্ত্তনের রস মিশ্রিত হইয়া জগাই মাধাইয়ের মনের ভিতরে কি ভাব উৎপন্ন করিত তাহা সেই অন্তর্যামী হরিই জানেন। তাহারা গৌরচন্দ্রকে দেখিয়া বলিত, নিমাই পণ্ডিত, তোমার মঙ্গলচণ্ডীর গীত কি সমাপ্ত হইল? তোমার গায়েন গুলি সব ভাল, তাহাদিগকে আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি, যেখানে যাহা আমরা পাইব তাহাদিগকে আনিয়া দিব। এই বলিয়া উপহাস বিদ্রূপ করিত। ভক্তগণ তাহাদিগকে দেখিয়া ভয়ে দূরে পলায়ন করিতেন।

এক দিন নিত্যানন্দ নগর ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন, এমন সময় বিকৃত গম্ভীর স্বরে কে রে! কে রে! বলিয়া পথের মাঝে জগাই মাধাই তাঁহাকে ধরিল, এবং জিজ্ঞাসা করিল তুমি কোথা যাও? তোমার নাম কি? ইহাদের প্রতি নিতাইয়ের যথার্থই একটু টান হইয়াছিল; তিনি বলিলেন আমার নাম অবধূত, আমি প্রভুর গৃহে যাইতেছি। মাধাই নাম শুনিবামাত্র ক্রোধভরে তাঁহার মস্তকে কলসির কাণা ফেলিয়া মারিল, তাহাতে মস্তক বিদ্ধ হইয়া অজস্রধারে শোণিতস্রোত বহিতে লাগিল, নিতাই কাতর অন্তরে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিলেন। কিন্তু রক্তধারা দেখিয়া

জগাইয়ের মনে দয়ার সঞ্চার হইল। মাধাই পুনরায় প্রহারে উদ্যত হইলে জগাই তাহার হাত ধরিয়া বলিতে লাগিল, তুই কেন নির্দ্দয় হইয়া এই বিদেশী সাধুকে মারিলি? পরিত্যাগ কর, ক্ষমা দে, অবধূতকে আর প্রহার করিস্ না, ইহাতে কি তোর ভাল হইবে? গণ্ডগোল রক্তপাত দেখিয়া পথের লোকেরা চৈতন্যকে এই সংবাদ জানাইল, তিনি সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত হইলেন। হইয়া দেখেন যে নিত্যানন্দের সর্ব্বাঙ্গে শোণিতধারা বহিতেছে, কিন্তু তিনি প্রসন্নচিত্তে জগাই মাধাইয়ের নিকট দণ্ডায়মান আছেন। তাহা দেখিবামাত্র শোকে দুঃখে ক্রোধে গৌরাঙ্গ একেবারে অস্থির হইলেন, আপনার উত্তরীয় বসনদ্বারা অবধূতের ক্ষত মস্তক বাঁধিয়া দিলেন। তাঁহাকে অধীর দেখিয়া নিতাই বলিলেন প্রভু, তুমি ক্ষান্ত হও, এই দুই জনের শরীর আমি তোমার নিকট ভিক্ষা চাহিতেছি। মাধাইকে মারিতে দেখিয়া জগাই আমাকে তাহার হস্ত হইতে রক্ষা করিল, দৈবে রক্তপাত হইয়াছে, আমি কোন দুঃখ পাই নাই। জগাইয়ের দয়ার কথা শুনিয়া গৌরাঙ্গ তাহাকে আলিঙ্গন দিয়া বলিলেন, নিত্যানন্দকে বাঁচাইয়া তুমি আমাকে আজ কিনিয়া রাখিলে, কৃপাময় কৃষ্ণ তোমাকে কৃপা করুন! আমি আশীর্ব্বাদ করি অদ্য হইতেই তোমার প্রেমভক্তি লাভ হউক! ভক্তগণ পাপীর প্রতি শ্রীচৈতন্যের দয়া দেখিয়া হরিধ্বনি করিলেন। পূর্ব্বেই জগার মন কতকটা নরম হইয়া আসিয়াছিল, পরে এই আশীর্ব্বাদ বাক্য শুনিয়া ও নিজের দুর্গতি অনুভব করিয়া একেবারে সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। গৌরের পদ ধারণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। এক দিকে ঘোর অত্যাচার, প্রহার শোণিত পাত; অপরদিকে প্রেমালিঙ্গন, স্নেহপূর্ণ শুভাশীর্ব্বাদ, ইহা কে সহিতে পারে? প্রেমের প্রচণ্ড পরাক্রম দেখিয়া পাষণ্ড ভ্রাতৃদ্বয় হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। পাপের পূর্ণাবস্থার ভীষণ মূর্ত্তি এবং প্রেমের কমনীয় পবিত্র ভাব এক সঙ্গে না দেখিলে পাপী ব্যক্তি সে পাপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় না। পাপ অল্পে অল্পে যখন নরহত্যা, ঘোর দুষ্ক্রিয়ায় পরিণত হয় তখন তাহার বিকটাকার দর্শনে মন চমকিয়া উঠে। প্রকাণ্ড পর্ব্বতসমান তুলারাশির উপর এক কণিকা অগ্নি পড়িলে যেরূপ হয়, এখানে ঠিক তাহাই হইল। পাষণ্ডদলন হরিভক্তির প্রভাব দুরন্ত মাধাইও আর অতিক্রম করিতে পারিল না, গৌর নিতাইয়ের উজ্জ্বল প্রেম প্রতিভা এবং মধুর অমায়িক ব্যবহার সন্দর্শনে সেও অবসন্ন হইয়া পড়িল। অনন্তর গৌরের

চরণে পড়িয়া সে বহু বিনয় সহকারে কাঁদিতে লাগিল। বলিল ঠাকুর, আমরা দুই দেহ এক জীবন, এক জনকে যদি কৃপা করিলে, আমাকে কেন আর তবে বঞ্চিত রাখ? চৈতন্য কহিলেন নিত্যানন্দের অঙ্গে তুমি রক্তপাত করিয়াছ, তাঁহার দেহ আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আমি তোমার কিছু করিতে পারি না, যদি তিনি তোমাকে ক্ষমা করেন তবেই তুমি রক্ষা পাইতে পার। যাঁহার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছ তিনিই তোমাকে ক্ষমা করিবেন। মাধাই তখন নিতাইয়ের চরণ ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল, এবং কাতরভাবে অনুতাপাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। নিতাই বলিলেন, আমার সুকৃতি আমি তোমাকে দিলাম, তোমার অপরাধ সব দূর হইল। এই বলিয়া মাধাইকে তিনি গাঢ় আলিঙ্গন দান করিলেন। শত্রুর প্রতি এতাদৃশ অভূতপূর্ব্ব প্রেম দেখিয়া সকলে অবাক্ হইয়া রহিল। তখন দুই জনে দুই ভাইয়ের পদতলে পড়িয়া আপনাদের উৎকট পাপ স্মরণ করত আত্মগ্লানিপূর্ণ হৃদয়ে দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। মহাপ্রভু বলিলেন, শুন জগাই মাধাই, তোমরা যদি আর পাপ না কর, তবে তোমাদের সমস্ত পুরাতন পাপ আমি গ্রহণ করিলাম, তোমাদের সে জন্য আর কোন ভয় নাই। ভগবানের কৃপায় যথার্থ অনুতাপ যদি হয়, তবে পুরাতন পাপরাশি সমূলে উৎপাটিত হইয়া যায়। পাপ দূর হওয়ার তাৎপর্য্য একবারে তাহা সমূলে বিনষ্ট হওয়া, এই জন্য গৌর তাহাদিগকে এই আশা বাক্য শুনাইলেন। অভয় প্রাপ্ত হইয়া জগাই মাধাই তাঁহার চরণে বার বার লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। অতঃপর গৌরাঙ্গ বৈষ্ণবদিগকে বলিলেন, এই দুই জনকে আমার গৃহে লইয়া চল, আজ আমি ইহাদিগকে লইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিব। ভক্তগণ একত্রিত হইয়া আনন্দের সহিত গভীর নিনাদে যখন হরিসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন তখন জগাই মাধাই পৃথিবীতে স্বর্গের শোভা দর্শন করিল। তাহারা ক্রমাগত ভক্তদিগের চরণধূলিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। এই সময়ের জন্য কোন রসগ্রাহী সাধু প্রেমবিজয় নিতাই চৈতন্যের মুখে নিম্নলিখিত সঙ্কীর্ত্তনটী তুলিয়া দিয়াছেন,

"আয় রে আয় জগাই মাধাই আয়।

মেরেছ তায় ভয় কি আছে আয়। হরিসঙ্কীর্ত্তনে নাচবি যদি আয়।

ও রে মার খেয়েছি না হয় আবার খাব, ও রে তবু হরিনাম দিব তোমায়।

ওরে মেরেছ কলসির কাণা, (মাধাইরে ! ওরে মাধাই)
ওরে তাই বলে কি প্রেম দিব না আয়।
ওরে আমরা দু'ভাই গৌর নিতাই, ওরে দু ভাইয়ে তরাব দু ভাই আয়।
তোদের স্নান করাব গঙ্গাজলে, হরিনামের মালা দিব গলে আয়।
ওরে আয়রে মাধাই কাছে আয়, হরিনামের বাতাস লাগুক গায় আয়।"

দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে যাহারা মহা ঘোর নরকে ডুবিয়া ছিল তাহারা একবারে স্বর্গে প্রবেশ করিয়া পতিতপাবন হরিনামরসে মত্ত হইল, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য অলৌকিক ক্রিয়া আর কি হইতে পারে ? যেন পাপের নদী পুণ্য-সাগরে গিয়া মিলিত হইল। মনুষ্য হইয়া কেহ যদি সমুদ্র শোষণ করে তাহাও ইহার নিকট আশ্চর্য্য নহে। বাহিরের অসাধারণ অলৌকিক কোন ঘটনা এইরূপ মহাপাপীর মন পরিবর্ত্তনের সঙ্গে কখন তুলনা হইতে পারে না। আজন্ম মূর্খ পাষণ্ড মদ্যপায়ী, বিষম দুষ্ক্রিয়ার যাহারা সাক্ষাৎ অবতার, হরিভক্তিরূপ দৈবশক্তিগুণে এবং পবিত্রাত্মা ভক্তদিগের অঙ্গস্পর্শে তাহারাও পুনর্জ্জন্ম লাভ করে। জগাই মাধাই অবিশ্রান্ত ক্রন্দনের সহিত গৌর নিতাইকে কতই স্তুতি মিনতি করিল ! নাম সঙ্কীর্ত্তনের পুণ্যভূমিতে তাহাদিগকে বিলুণ্ঠিত দেখিয়া সকলে বিমোহিত হইলেন। পাপিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের সেই ক্রন্দন অনুতাপ স্তব আর্ত্তনাদ শ্রবণে পাষাণ ভেদ হইয়া যাইতে লাগিল। ভক্তগণ চৈতন্যকে প্রশংসা করিয়া বলিলেন প্রভো ! কাহার বাপের সাধ্য যে তোমার এই মহিমা বুঝে ? তুমি দুরাত্মা মদ্যপ জগাই মাধাইকে পদানত করিলে ! গৌর বলিলেন অদ্য হইতে তোমরা আর ইহাদিগকে মাতাল বলিয়া ঘৃণা করিও না, ইহাদের যে কিছু অপরাধ থাকে তাহা মার্জ্জনা করিয়া তোমরা এই দুই জনকে আশীর্ব্বাদ কর। জগাই মাধাই প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ সমস্ত ভক্তবৃন্দের চরণধূলি লইতে লাগিল। তাহাদের চিরজীবনের পাপরাশির উপর অনুতাপ অশ্রু পড়িয়া যেন নিমেষের মধ্যে সমস্ত ধৌত করিয়া ফেলিল। বৈষ্ণব ভাগবতগণ সকলেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর চৈতন্য ভ্রাতৃদ্বয়কে আশা দিয়া বলিলেন, আর তোমাদের কোন চিন্তা নাই, আজ তোমরা সশরীরে স্বর্গলাভ করিলে। এই বলিয়া তাহাদিগকে উঠাইয়া পরম আনন্দের সহিত নৃত্য গীত সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। আহা সে কি চমৎকার শোভা ! সেই বিখ্যাত পুরাতন পাপী জগাই মাধাই গলদশ্রুলোচনে গৌরচন্দ্রের সঙ্গে

সঙ্গে নাচিতে লাগিল! চৈতন্য সকলকে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা এই দুই জনকে আর পাপী মনে করিয়া পরিহাস করিবে না, আপনাদের সমতুল্য জ্ঞান করিয়া শ্রদ্ধা করিবে, তাহা না করিলে তোমাদের সর্ব্বনাশ হইবে। উদারাত্মা বৈষ্ণবগণ তাঁহার কথা শুনিয়া জগাই মাধাইকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। সত্য সত্যই তখন আর তাহারা পাপী ছিল না, ভগবানের কৃপায় সাধুভাবে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। অভ্যাসের পাপ শীঘ্র যায় না সত্য, কিন্তু ঈশ্বরের কৃপাবারি সংস্পর্শে অচিরে তাহা ধৌত হইয়া যায়।

পর দিন সেই মত্ততার বেশে ধূলিধূষরিত অঙ্গে সকলে গঙ্গাস্নানে গিয়া জলক্রীড়া করিলেন। ভক্তদলের মধ্যে আমোদ প্রমোদ হাসি মস্করাম যথেষ্ট ছিল। নিত্যানন্দের সঙ্গে অদ্বৈতাচার্য্যের কিছু অধিক রঙ্গ রস চলিত। নিতাই বৃদ্ধের চক্ষে জলের ছিটা মারিলেন। বৃদ্ধ আমোদচ্ছলে কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, শ্রীবাস ব্রাহ্মণের যেমন জাতি নাই, তেমনি কোথা হইতে এক অবধূত আনিয়া জুটাইয়াছে। এ ব্যক্তি পশ্চিমে গিয়া কত লোকের অন্ন খাইয়াছে, ইহার পিতা মাতা গুরু কে তাহাও জানি না; কোন্ কুলে জন্ম, কোথায় বাড়ী ঘর কিছুই স্থির নাই; কোথাকার একটা মাতাল! এইরূপ পরিহাস করিয়া দুই জনে জলক্রীড়া করিলেন। পরে ভাগীরথীতীরে জগাই মাধাইকে বিশেষরূপে অভিষেক করা হয়। তাহাদের হস্তে তুলসীপত্র দিয়া চৈতন্য বলিলেন, তোমরা এই পত্রের সহিত সমুদায় পাপভার আমার হস্তে অর্পণ কর, আমি তোমাদের পাপভার গ্রহণ করিলাম। তাঁহার আশাপ্রদ মধুর বাক্য শ্রবণে ভ্রাতৃদ্বয় কাঁদিয়া আকুল হইল। বলিল প্রভো! আমাদের যে পাপের অন্ত নাই, এ মহাপাষণ্ডদের কি আর প্রায়শ্চিত্ত আছে? এই বলিয়া তাহারা গৌরাঙ্গের চরণে পুনঃপুনঃ লুটাইতে লাগিল, ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। এই সময়কার দৃশ্য অতীব আশ্চর্য্যজনক হইয়াছিল। তদনন্তর গৌর বিশ্বম্ভর নিজের গলার মালা তাহাদিগের গলায় দিয়া সকলকে বলিলেন, আমি তোমাদের হস্তে এই দুই জনকে সমর্পণ করিলাম। মহাপ্রভু চৈতন্যের প্রচারক্ষেত্রে এমন মনোহর ব্যাপার আর হয় নাই। এই হইতে ইহাঁর নাম বিশেষরূপে বিখ্যাত হয়, এবং কর্ম্মী জ্ঞানী কুতার্কিক ভক্তিবিদ্বেষী সকলে একেবারে বিস্ময়াপন্ন হইয়া যায়। জগাই মাধাই হরিনামে মাতিবে এ কথা সহসা কাহারো বিশ্বাস হইতে পারে না। কিন্তু প্রত্যক্ষ ঘটনা

সকলকে বিশ্বাস করিতে হইল। গৌরাঙ্গের প্রতাপ বাড়িল, সাধু ভক্ত-জনের আনন্দ এবং পাপী দীনাত্মাদিগের আশা বৃদ্ধি হইল। হরিনামের যে কি অদ্ভুত মাহাত্ম্য তাহা জগাই মাধাই পাপীদ্বয়ের জীবনে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইল।

জগাই মাধাই প্রতি দিন উষাকালে গঙ্গাস্নান করিয়া দুই লক্ষ হরিনাম জপ করেন আর পূর্ব্ব পাপ স্মরণ করিয়া কাঁদেন, কিছুতেই আর তাঁহাদের সে দুঃখের বিরাম হয় না। এক এক বার গৌরচন্দ্র বাপ! বলিয়া ভ্রাতৃ-দ্বয় কাতরস্বরে বিলাপ করিয়া উঠিতেন। নির্ম্মল দর্পণে যেমন নিজমূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়, ইহাঁরা নবজীবনের দর্পণে তেমনি পূর্ব্বজীবন দেখিয়া আপনাদিগকে শত শত ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। সর্ব্বদা অনুতাপ আর নাম জপ, আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া গেল। চৈতন্য স্বয়ং কখন কখন ভক্তগণসঙ্গে তাঁহাদিগের নিকট গিয়া প্রবোধ দিয়া আহার করাইয়া আসিতেন। অনুতাপের প্রজ্বলিত হুতাশনে জগাই মাধাইয়ের রাশি রাশি পাপ দগ্ধ হইতে লাগিল। কয়েক দিন পরে জগাইয়ের মন কথঞ্চিৎ শান্ত হইল, কিন্তু মাধাই আর কিছুতেই সুস্থির হইতে পারেন না। তিনি অব-ধূত নিত্যানন্দকে প্রহার করিয়াছেন ইহা যত বার স্মরণ করেন, ততবারই নয়নজলে বুক ভাসিয়া যায়। নিরন্তর এই ভাবিয়া তিনি বিস্তর খেদ করিতে লাগিলেন। পুনরায় এক দিন আবার নিতাইয়ের পদধারণ পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, এবং স্তব স্তুতি বিনয় করিয়া বলিলেন, ঠাকুর! আমি তোমার শ্রীঅঙ্গে রক্তপাত করিয়াছি, এ অপরাধ কি আমার ঘুচিবে? নিতাই প্রেমভরে আলিঙ্গন দিয়া মাধাইকে আশ্বস্ত করিলেন এবং বলিলেন, বাপে কি সন্তানের অপরাধ কখন ধরে? মাধাই বলিল ঠাকুর! আমি যে যে লোকের বিরুদ্ধে অপরাধ করিয়াছি তাহাদের সকলকেত চিনি না, তবে কিরূপে তাহাদিগের নিকট ক্ষমা চাহিব, এক্ষণে উপায় কি বলিয়া দিন। নিতাই এই পরামর্শ দিলেন যে, তুমি গঙ্গাস্নানের পথে গিয়া বসিয়া থাক, যত লোক স্নান করিতে যাইবে সকলকে বিনয়পূর্ব্বক নমস্কার করিও, তাহা হইলে তাহারা প্রসন্ন হইয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবে এবং তোমার অপরাধ ভঞ্জন হইয়া যাইবে। মাধাই অবিলম্বে গঙ্গার ঘাটে গিয়া বসিলেন। লোকদিগকে দেখিয়া তাঁহার মনে বড় আহ্লাদ জন্মিল। তখন অবনত মস্তকে সজলনয়নে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া এইরূপে সকলকে বলিতে লাগিলেন,

জ্ঞাত কিংবা অজ্ঞাতসারে আমি যত অপরাধ করিয়াছি তাহা হইতে মুক্ত করিয়া তোমরা আমার প্রতি প্রসন্ন হও! নবদ্বীপবাসী নরনারী মাধাইয়ের ব্যাকুলতা বিনয় দেখিয়া কেহ আর ক্রন্দন সংবরণ করিতে পারে না। তাহারা প্রশংসা করিয়া বলিতে লাগিল, নিমাই পণ্ডিত ধন্য যে তিনি এমন লোককে সচ্চরিত্র করিলেন! তাঁহার কীর্ত্তনই যথার্থ কীর্ত্তন। তিনি ঈশ্বরের প্রকৃত সেবক। তাঁহাকে যাহারা নিন্দা করে তাহারা দুর্জ্জন পাষণ্ড। মাধাইয়ের পরিবর্ত্তন দেখিয়া চৈতন্যকে ক্রমে অনেক লোক চিনিতে পারিল। তদবধি অনেকে তাঁহার নিন্দা করিতে সঙ্কুচিত হইত। মাধাই নিজে কোদালি ধরিয়া পরিশ্রম করিতেন আর গঙ্গাতীরে দিবানিশি তপস্যায় নিযুক্ত থাকিতেন। পরিশেষে তিনি এক জন সাধকের ন্যায় সাধারণের চক্ষে প্রতীত হন। যে স্থানে তিনি থাকিতেন তাহা মাধাইয়ের ঘাট বলিয়া বিখ্যাত হয়।

রসভঙ্গ এবং পরিতাপ।

বহির্দ্বার বদ্ধ করিয়া শ্রীবাসের গৃহে চৈতন্য প্রতি রজনীতে সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। এক দিন কিছুতেই আর ভাবাবেশ হয় না, নৃত্য করেন সুখ পান না, হরি বলেন অন্তরে উল্লাস জন্মে না; পূর্ণ মাত্রা ভক্তি না হইলে তাঁহার হৃদয় কিছুতেই আরাম বোধ করিত না। তখন মহা দুঃখিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, আজি কেন আমার প্রতি প্রভুর কৃপা হইতেছে না? সকলেই মহা ভাবিত হইলেন, শেষ স্থির করিলেন দেখ তবে ঘরের মধ্যে কেহ হয়ত লুকাইয়া আছে। শ্রীবাস পণ্ডিত সমস্ত বাড়ী অন্বেষণ করিয়া অনেক কষ্টের পর শেষ দেখেন যে তাঁহার শাশুড়ী ঠাকুরাণী কীর্ত্তনের ঘরের এক কোণে ডোলের আড়ালে লুকাইয়া রহিয়াছেন। জামাতার গৃহবাসিনী গরিব বিধবা শাশুড়ীর দুরবস্থা চিরকালই সমান। কীর্ত্তনের রসভঙ্গ হই-তেছে, চৈতন্য অসুখ অনুভব করিতেছেন, ইহাতে পারিষদগণের মনে কিরূপ ক্ষোভ বিরক্তি হইতে পারে তাহা সহজেই বুঝা যায়। শ্রীবাস ক্রোধ-ভরে শাশুড়ীর কেশাকর্ষণপূর্ব্বক তাহাকে টানিয়া বাহির করিলেন। দুঃখিনী নারী গৌরের কীর্ত্তন শুনিবে, নৃত্য দেখিবে, এই অভিলাষে ঘরের কোণে লুকাইয়াছিল, কিন্তু তাহা কপালে ঘটিবে কেন? শাশুড়ী হইয়া জামাতার গৃহে দুহিতার সহচরী হইয়া থাকা অনেক পাপের ফল; সুতরাং সে বিধবার অদৃষ্টে আর হরিসঙ্কীর্ত্তন শুনা ঘটিল না। সে বাহির হইবামাত্র চৈতন্যের ভাবাবেশ উপস্থিত হইল, কীর্ত্তন জমিয়া গেল, ভক্তগণ হাসিতে লাগিলেন, শ্রীবাসও প্রেমে মত্ত হইলেন। তদনন্তর ভক্তগণ নির্ব্বিঘ্নে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। চৈতন্য সে দিন এক একবার এমনি ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন যে, তাহা শুনিয়া পাষাণ বিদীর্ণ হইয়া যায়। তিনি সকলকে বলি-লেন "ভাই সকল! হরি আমার প্রাণ জীবন পিতা মাতা, তাঁহার দাসত্ব ভিন্ন আমার অন্য গতি নাই, তোমরা আমার চিরকালের বন্ধু, যদি কখন আমাকে ইহার অন্যথাচরণ করিতে দেখ তবে তখনই আমাকে বলিও।" জ্ঞাতসারে সহজে কেহ তাঁহার পদধূলি লইতে পারিতেন না, বরং তিনিই বৈষ্ণবদিগের পদস্পর্শ করিয়া তাঁহাদিগকে মহা ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন। অদ্বৈতকে

তিনি গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন, তাঁহার পায়ের ধূলা লইতেন, কিন্তু তিনি লইতে গেলে চৈতন্য মহা রাগ করিতেন; ইহাতে অদ্বৈত বড় বিপদে পড়িতেন। যখন তাঁহার ভাবাবেশ হইয়া চেতনা রহিত হইত, সেই অবসরে গোপনে অদ্বৈত আচার্য্য মনের সাধ পূর্ণ করিয়া লইতেন। একদিন বিশ্বম্ভরের কীর্ত্তনে রসভঙ্গ হওয়াতে কে তাঁহার পদধূলি লইয়াছে এই সন্দেহ করিয়া তিনি অদ্বৈতকে ধরিয়াছিলেন। বিনয় তাঁহার যথেষ্ট ছিল। তাহা দেখিয়া পারিষদগণ মনে করিতেন এ সব ছলনা এবং আত্মগোপন করিবার ইচ্ছা। কিন্তু গৌরের কাছে সেটি হইবার যো ছিল না, যাহা তাঁহার মনে তাহাই বাহিরে প্রকাশ পাইত, অন্তর বাহির সমান ছিল। যেমন তাঁহার হরিপ্রেম ব্যাকুলতা, তেমনি ভ্রাতৃপ্রেম সাধুভক্তি সরলতা। সে দিন কীর্ত্তন করিতে করিতে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর ভক্তিভাব দেখিয়া গৌর বড় আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। শুক্লাম্বর এক জন মহৎ লোক, ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিতেন, আর সর্ব্বদা হরিরসে মগ্ন থাকিতেন। চৈতন্য বৈরাগ্য, দীনতা, অনাসক্তি যাহার জীবনে দেখিতেন তাঁহাকে অত্যন্ত সমাদর করিতেন।

এক দিন বন্ধুবর্গের সহিত শচীকুমার নগরমধ্যে ভ্রমণ করিতেছেন। কয়েক জন বিরুদ্ধবাদী বলিল, ও হে নিমাই পণ্ডিত! তুমি নিশাকালে লুকাইয়া কীর্ত্তন কর, আমরা বন্ধুভাবে নিষেধ করিলাম তাহাতো শুনিলে না, এ কথা কিন্তু রাজার কর্ণগোচর হইয়াছে, শীঘ্র দেখিবে কি হয়, তোমাকে ধরিবার জন্য রাজাজ্ঞা বাহির হইয়াছে। গৌর সে কথা অগ্রাহ্য করিয়া কহিলেন, আচ্ছা আচ্ছা! আমি রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব। আমাকে যে অন্বেষণ করিতে চায় আমি তাহাকে দেখা দিব। সে দিন কীর্ত্তনের সময় ভক্তগণকে তিনি বলিলেন, অদ্য পাষণ্ডীদিগকে সম্বোধন করিয়া নাম গাও, তাহাদের সকল দুঃখ দূর হউক। গৌরাঙ্গ কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন বটে, কিন্তু কিছুতেই আর ভাবোদয় হয় না, চিত্ত বড় অস্থির হইল। বন্ধুদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ভাই সকল! আজ কেন আমার ভাবাবেশ হইতেছে না, আমার বা কোন অপরাধ হইল; তোমরা আমাকে ক্ষমা করিয়া আমার প্রাণ বাঁচাও।" এই বলিয়া অনেক কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কি দুঃসহ বিরহজ্বালায় তিনি দগ্ধ হইতেছিলেন তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। বৃদ্ধ অদ্বৈত সেই খানে শয়ান ছিলেন, উঠিয়া ভ্রূকুটি করিয়া নাচিতে লাগিলেন। ইনি অনেক রঙ্গ রস জানিতেন। যদিও বয়সে সকলের অপেক্ষা

প্রাচীন, কিন্তু বড় রসিক ছিলেন। আচার্য্য গোসাঞী প্রেমাহ্লাদে মত্ত হইয়া অনেক বিধ আমোদ পরিহাস করিতেন। তিনি বলিলেন, অদ্বৈত শুইয়া আছে, প্রেম হইবে কেন? আমি এবং শ্রীবাস বাহিরে পড়িয়া রহিলাম, যত তিলি মালীর সঙ্গে তোমার প্রেমবিলাস। অবধূত হইল তোমার প্রেমের ভাণ্ডারী! গোসাঞী! তুমি যদি আমাকে প্রেমযোগ না দাও তবে আমি সব শুষিয়া ফেলিব! বৃদ্ধের এ সকল অভিমানের কথা ভিন্ন আর কোন মন্দ ভাবের নহে। চৈতন্য কিছু না বলিয়া বিষাদিত মনে দ্বার খুলিয়া বাহির হইলেন, হরিদাস এবং নিতাই পশ্চাতে চলিলেন। প্রেমহীন দেহ ধারণে ফল কি, এই ভাবিয়া গৌরচন্দ্র একেবারে জাহ্নবীর জলে গিয়া পড়িলেন। নিতাই তখনই তাঁহার কেশে ধরিলেন, হরিদাস পদদ্বয় ধরিয়া উপরে তুলিতে চেষ্টা করিলেন। কেন তোমরা আমাকে ধর? প্রেমহীন জীবনে কি কাজ আছে? এই বলিয়া বিশ্বম্ভর তাঁহাদিগকে ধমক্ দিতে লাগিলেন। সকলে কম্পিত কলেবর, আজ না জানি ঠাকুর বা কি করেন। নিতাই কাঁদিয়া আকুল হইলেন। অনেক ক্ষণ ধরিয়া তাঁহাকে বুঝান হইল। তখন চৈতন্য তাঁহাদিগকে এই অনুরোধ করিলেন যে, অদ্য আমি গোপনে বাস করিব, এ কথা তোমরা কাহাকেও বলিবে না। ইহা বলিয়া সে দিন সমস্ত রাত্রি নন্দন আচার্য্যের গৃহে তিনি বাস করেন। রজনীতে তাঁহার সঙ্গে কথা বার্ত্তা কহিয়া মন কতকটা শান্ত হইল। এ দিকে ভক্তগণ গাভী হারা বৎসের ন্যায় নানা স্থান অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছেন, কোথাও আর গৌরের দেখা পান না; অদ্বৈত দুঃখে শোকে অনাহারে ভূতলে পড়িয়া রহিলেন। পর দিন প্রাতে শ্রীবাসকে ডাকাইয়া তাঁহার সঙ্গে গৌরচন্দ্র অদ্বৈতের নিকট গেলেন এবং সকলের আনন্দ বর্দ্ধন এবং সন্তোষ উৎপাদন করিলেন।

সখীভাবে নৃত্য গীত।

একদা গৌরাঙ্গ সুন্দর পারিষদবর্গকে ডাকিয়া বলিলেন, অদ্য আমি প্রকৃতিবেশে নৃত্য করিব। গদাধরকে রুক্মিণী, ব্রহ্মানন্দকে তালবুড়ী, নিতাইকে বড়াই, হরিদাসকে কোতয়াল, শ্রীবাসকে নারদ সাজিতে হইবে। সদাশিব এবং বুদ্ধিমন্ত খাঁয়ের প্রতি অনুমতি হইল যে, তোমরা চন্দ্রশেখরের গৃহে শঙ্খ কাঁচুলী পাটসাড়ী অলঙ্কারাদি সমুদায় প্রস্তুত রাখিবে। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ সামিয়ানা খাটাইয়া সরার উপর সরিষার পুঁটলি জ্বালিয়া রোসনাই করিলেন। এই প্রস্তাবে বৈষ্ণবদিগের চিত্তে মহা আহ্লাদ জন্মিল। গৌর বলিলেন আমি সখীবেশে নৃত্য করিব, কিন্তু জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ভিন্ন তথায় কেহ প্রবেশ করিতে পারিবে না। এই কথা তিনি খুব শক্ত করিয়া ধরিয়া বসিলেন, তাহাতে অনেকেরই মুখ শুকাইয়া গেল। অদ্বৈত সর্ব্বাগ্রে মাটিতে আঁচড় দিয়া বলিলেন, আমিত বাপু সেখানে তবে যাইতে পারিব না, আমি অজিতেন্দ্রিয় মনুষ্য, আজিকার নৃত্য দেখা আমার কার্য্য নহে। শ্রীবাস বলিলেন আমারও ঐ কথা। তখন চৈতন্য গোসাঞী মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, তোমরা সকলে না গেলে কাহাকে লইয়া তবে নৃত্য হইবে? কোন চিন্তা নাই, তোমরা আজ মহা যোগেশ্বর হইবে, চল! তখন সকলে অভয় প্রাপ্ত হইয়া নৃত্য দেখিতে চলিলেন। শচীদেবী বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীবাসের গৃহিণী মালিনী এবং অপরাপর বৈষ্ণবগণের পরিবার চন্দ্রশেখরের গৃহে সমাগত হইলেন। বিষয়টা ঠিক কৃষ্ণযাত্রার মত। প্রথমে মুকুন্দ সঙ্কীর্ত্তন করিয়া যাত্রা আরম্ভ করিলেন। পরে হরিদাস প্রকাণ্ড এক যোড়া কৃত্রিম গোঁফ পরিয়া মস্তকে পাগড়ী বাঁধিয়া হস্তে দণ্ড লইয়া আসরে উপস্থিত হইলেন। শ্রোতৃবর্গকে জাগ্রত করা তাঁহার প্রথম কার্য্য। তাঁহাকে দেখিয়া সকলে হাসিতে লাগিল। তদনন্তর শুভ্র কেশশ্মশ্রুধারী বীণাহস্ত শ্রীবাস ঠাকুর নারদ হইয়া আসিলেন, রামাই ভৃত্য সাজিয়া তাঁহার সঙ্গে কুশাসন লইয়া উপস্থিত হইলেন। শচী মালিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইনিই কি শ্রীবাস পণ্ডিত? তাঁহাকে দেখিয়া সকলের মন বিস্ময়রসে পূর্ণ হইল। প্রথম রাত্রিতে গৌরচন্দ্র রুক্মিণী

সাজিয়া তদুপযুক্ত ভাব ভঙ্গী প্রদর্শন করেন। পরে গদাধর ও ব্রহ্মানন্দ গোপিনী সাজিয়া অভিনয় করিলেন। তাঁহাদিগকে কোতয়াল এবং নারদ বলিলেন, তোমরা কোথায় যাইবে? কে তোমরা? অদ্বৈত বলিলেন, পর-নারী মাতৃবৎ, কেন আর ইহাদিগকে লজ্জা দাও? বলি ও গো! তোমরা নৃত্য গীত কর, প্রচুর ধন পাইবে, আমাদের ঠাকুর নৃত্য গীত বড় ভাল বাসেন। তখন সখীদ্বয় গাইতে এবং নাচিতে লাগিলেন। গদাধর বড় ভাবুক, তিনি নিজে মুগ্ধ হইয়া সকলকে মুগ্ধ করিলেন, প্রেমসলিলে সকলের চিত্ত দ্রবীভূত হইল। পরিশেষে বিশ্বম্ভর গোপীকার বেশে নিত্যানন্দকে সহচরী করিয়া আসরে সমাগত হইলেন। তাঁহার রূপে চারিদিক্ আলোক-ময় হইল। তিনি পরমাসুন্দরী দেবকন্যার ন্যায় দিব্য লাবণ্যময়ী সখী সাজিয়া সকলকে একবারে আশ্চর্য্যরসে নিমগ্ন করিয়াছিলেন। যেন সাক্ষাৎ ভক্তি মূর্ত্তিমতী হইয়া জননীর ন্যায় সকলের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাঁহাকে দেখিয়া সকলের মনে মাতৃভাব সমুদিত হয়। জননী বলিয়া তাঁহাকে ভক্ত-গণ স্তব স্তুতি বন্দনা করিলেন। প্রেমভক্তিরসে বিগলিত হইয়া দর্শক নর-নারী সকলে কাঁদিয়া আচ্ছন্ন হইল। বিশ্বম্ভর মাতৃভাবে শ্রোতাগণের হৃদয়ে এমনি ভক্তি উদ্দীপন করিলেন যে, চন্দ্রশেখরের গৃহ আনন্দধাম হইয়া উঠিল। সে ভাবের তেজ সপ্ত দিবস পর্য্যন্ত ছিল। রাত্রি প্রভাত দেখিয়া সকলে বড় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এইরূপে সে দিনকার ব্যাপার সমাপ্ত হয়।

ভাবুক বৈষ্ণবদল প্রেম ভক্তির রসেই উন্মত্ত, মনে যখন যে ভাবের উদয় হইত তখন বিপরীত প্রকৃতিবিশিষ্ট বস্তু এবং ব্যক্তিতেও তাঁহারা সে ভাবের ছবি দেখিতেন। যা হউক, যাত্রাতে কিছু আনন্দ এবং উপকার অধিক হইয়াছিল। এ প্রকার নৃত্যের তাৎপর্য্য এই যে, পুরুষেরা পুরুষত্ব বিস্মৃত হইয়া প্রকৃতিভাবাপন্ন হইলে কামরিপুর হস্ত হইতে একবারে নিষ্কৃতি লাভ করে। সখীভাবে ব্রজাঙ্গনাগণ কৃষ্ণের সহিত মাধুর্য্যরস আস্বাদন করিয়া-ছিলেন ইহা সেই নিঃস্বার্থ কামগন্ধহীন প্রেমলীলার অনুকরণ। ঈশ্বরকে পতিভাবে ভজনা করাই তাঁহাদের মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্মসাধন, ইহা ঈশ্বর-প্রেমের চরমাবস্থা। এরূপে না ভজিলে ভক্তের প্রেমপিপাসা চরিতার্থ হয় না, অনেকের এই বিশ্বাস ছিল। ব্রজগোপীরা নিষ্কামভাবে ভগবান্‌কে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া তাঁহাকে প্রাণপতিরূপে গ্রহণ করত মাধুর্য্যরস সম্ভোগ করেন।

গৌরের শান্তিপুর দর্শন।

চৈতন্য গদাধর ও নিতাইকে লইয়া নানা ভাবে নানা স্থানে বিহার করিয়া বেড়ান, যেথানে সেথানে সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত হন, শুদ্ধচিত্ত ভক্তগণ সকলেই সুখী, কেবল অদ্বৈতের আর কিছুতেই মনঃক্ষোভ নিবৃত্ত হয় না। তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা যে দাস্যভাবে শিষ্যের ন্যায় চৈতন্যের সঙ্গে থাকেন, কিন্তু তিনি বলবান্ যুবাপুরুষ বলপূর্ব্বক বৃদ্ধের পদধূলি লয়েন। অদ্বৈত এ বিষয়ে এক উপায় মনে মনে স্থির করিয়া পরম মিত্র হরিদাসের সঙ্গে শান্তিপুর চলিয়া গেলেন। তথায় গিয়া কেবল যোগবাশিষ্ঠ পাঠ করেন আর ভক্তির গৌরব হ্রাস করিয়া জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাহার ব্যাখ্যা করেন। বৃদ্ধের রঙ্গ দেখিয়া হরিদাস কেবল হাসিতেন আর কিছু বলিতেন না।

কিছু দিবস পরে এক দিন চৈতন্য দেব নগরে বিচরণ করিতে করিতে নিতাইকে বলিলেন চল আমরা শান্তিপুর যাই। যে ইচ্ছা সেই কার্য্য, অমনি দুই জনে গঙ্গা পার হইয়া শান্তিপুরে চলিলেন। গঙ্গার তটে কুটীর-মধ্যে এক সন্ন্যাসী বাস করিত, ভ্রাতৃদ্বয় তৃষ্ণায় এবং পথশ্রান্তিতে কাতর হইয়া তাহার নিকট গিয়া উঠিলেন। গৌর সেই সন্ন্যাসীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী সন্তুষ্ট চিত্তে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল, তোমার ধন বংশ বিদ্যা লাভ হউক, বিবাহ হউক! আশীর্ব্বাদ শুনিয়া শচীনন্দন বলিলেন গোসাঞী! এ কি প্রকার আশীর্ব্বাদ? বল যে ভগবানের চরণে ভক্তি হউক। সন্ন্যাসী দুঃখিত হইয়া বলিল, হে ব্রাহ্মণতনয়! আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিলাম, তুমি কোথায় কৃতজ্ঞ হইবে, না আবার নিন্দা করিতেছ? পৃথিবীতে জন্মিয়া যে বিলাস সুখ ধন ঐশ্বর্য্য উত্তম কামিনীর সহবাস ভোগ না করিল তাহার জীবনই বৃথা। ইহাতে কি তুমি লজ্জা পাইতেছ? তোমার বিষ্ণুভক্তি থাকিলই বা? যদি অর্থ না থাকে তবে কি খাইয়া বাঁচিবে? গৌর শুনিয়া হাসিয়া সন্ন্যাসীকে বলিলেন দেখ! যাহার ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই হইবে, ভক্তিই সার, তদ্ব্যতীত যত কিছু সকলই মিথ্যা, অসার। জীবের চিত্ত বিষয়সুখে বড় সন্তুষ্ট হয়, তাই শাস্ত্র এবং ধর্ম্মসাধনপ্রণালী এই রূপ নিকৃষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। সন্ন্যাসী এ কথা শুনিয়া মনে

করিল, সঙ্গের এই অবধূত হয়ত যুবাটিকে কি মন্ত্র দিয়া পাগল করিয়াছে। নিতাই তাহাকে বলিলেন মহাশয়! ছেলে মানুষের সঙ্গে আর বিচারে কাজ নাই, আমি আপনাকে চিনিয়াছি। তখন সে সন্তুষ্ট হইয়া অতিথিদ্বয়কে ফল মূল দুগ্ধ আহার করিতে দিল। পরে ইঙ্গিত করিয়া নিতাইকে বলিতেছে, তোমার এ সব চলে কি? আইস আনন্দ করা যাউক। নিত্যানন্দ অনেক তীর্থ, অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন, বামাচারী মদ্যপায়ী সন্ন্যাসীর ভাব গতি সব বুঝিতেন। পুনঃ পুনঃ আমন্দ কর, আনন্দ কর বলিতে লাগিল শুনিয়া চৈতন্য অবধূতকে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। শেষ যখন বুঝিলেন যে সন্ন্যাসী মদ খাইতে অনুরোধ করিতেছে, তখন তিনি বিষ্ণু! বিষ্ণু! বলিয়া কাণে হাত দিলেন এবং তদ্দণ্ডে আচমন করিয়া দুই জনে গম্য স্থানে প্রস্থান করিলেন। সন্ন্যাসী কেবল মদ্যপায়ী নহেন, তাঁহার কুটীরে একটী স্ত্রীলোকও দেখা গিয়াছিল।

গৌর নিতাই অদ্বৈতভবনে উপনীত হইয়া দেখেন, বৃদ্ধ আচার্য্য জ্ঞান-মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছেন আর ঢুলিতেছেন। ইহা দেখিয়াই চৈতন্যের মন উত্তেজিত হইয়া উঠিল। আচার্য্যকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, বল দেখি জ্ঞান বড়, কি ভক্তি বড়? গৌরকে রাগাইয়া মার খাইবার ইচ্ছাতেই অদ্বৈত এই চাতুরী খেলিয়াছিলেন; তিনি উত্তর দিলেন, জ্ঞানই সর্ব্বকালে শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান বিনা ভক্তিতে কি হয়? শচীনন্দন যাই এই কথা শুনিলেন অমনি ঘরের দাওয়া হইতে বৃদ্ধকে নামাইয়া উঠানে ফেলিয়া দমাদম্ কিল্ মারিতে লাগিলেন। ভক্তির প্রতি কণামাত্র অনাস্থা দেখিলে তিনি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিতেন। একান্ত নির্ভর আত্মত্যাগ তাঁহার ধর্ম্ম ছিল, তাহার মধ্যে বিন্দু-মাত্র জ্ঞানাভিমান, সাধন ভজন তপস্যাগত তমঃ স্থান পাইত না। এই জন্য বৃদ্ধকে প্রহার করেন। সীতাঠাকুরাণী দেখিলেন ঘোর বিপদ উপস্থিত, আস্তে ব্যস্তে আসিয়া বলিলেন, আরে কর কি! কর কি! বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রাখ রাখ! যদি কিছু ভাল মন্দ হয় তোমার ঘাড়েই সব পড়িবে। কেইবা তাঁহার কথা শুনে, গৌরচন্দ্র মহা তর্জ্জন গর্জ্জন ও প্রহার আরম্ভ করিলেন। রঙ্গ দেখিয়া নিতাই হাসেন, হরিদাস ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করেন, এ দিকে বৃদ্ধ কৃতার্থ হইয়া আনন্দসাগরে ভাসিতেছেন। প্রহার সমাপ্ত হইলে অদ্বৈত বলিলেন, তুমি ভালই করিলে, যেমন অপরাধ করিয়াছিলাম তেমনি শাস্তি পাইলাম। ইহাতেই আমার আনন্দ। এখন কোথা গেল তোমার সে স্তব স্তুতি? এই

কথা বলেন, আর নানা অঙ্গভঙ্গীর সহিত হাতে তালি দিয়া উঠনময় নাচিয়া বেড়ান। অতঃপর বিশ্বম্ভরকে কহিলেন, শাস্তিত দিলে, এখন পদছায়া দাও, তোমার পাতের উচ্ছিষ্ট আমার প্রাপ্য। এই বলিয়া তিনি গৌরচন্দ্রের চরণে মস্তক রক্ষা করিলেন। তখন চৈতন্য সসম্ভ্রমে উঠিয়া বৃদ্ধকে কোলে লইলেন, চারি দিকে ক্রন্দনের রোল উঠিল, প্রেমের নদী বহিতে লাগিল, নিতাই হরিদাস অদ্বৈতের পরিবার পুত্র দাস দাসী সকলে কাঁদিয়া একেবারে অস্থির হইল। দেখিয়া শুনিয়া বিশ্বম্ভর কিঞ্চিত লজ্জিত হইলেন। বৃদ্ধের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া অঙ্গীকার করিলেন, তোমার অনুরোধে আমি শত অপরাধীকেও ক্ষমা করিব। অদ্বৈতের আর আনন্দের সীমা রহিল না। প্রেম ভক্তির বিচিত্রতা কে বুঝিবে, ভক্তের দাস হইবার জন্য কতই আগ্রহ! অদ্বৈত বলিলেন, তোমাকে লঙ্ঘন করিয়া যে আমাকে ভক্তি করিবে সে বিনষ্ট হইবে। যে তোমার দাস না হয় সে আমার কখন প্রিয় হইতে পারিবে না। চৈতন্য বলিলেন, যাহারা আমার স্বগণদিগকে ভাল না বাসিয়া আমাকে ভাল বাসিতে আসিবে তাহাদিগকে আমি গ্রাহ্য করিব না। কত ক্ষণ পরে গৌর হাস্যমুখে বলিলেন, আমি কি আজ কিছু চঞ্চলতা প্রকাশ করিয়াছি? বৃদ্ধ বলিলেন, না, এমন কিছু নয়! নিত্যানন্দ এই অবসরে পরিহাসচ্ছলে বলিয়া রাখিলেন, যদি আমার কিছু চঞ্চলতা দেখ তবে ক্ষমা করিতে হইবে; ইহাতে হাসির ঘটা পড়িয়া গেল। সুরাপায়ী মাতালদিগের সঙ্গে ইহাঁদের ব্যবহার আচরণের অনেক মিল আছে। তদনন্তর চারি জনে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিলেন। ক্রমে মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হইলে সীতাদেবী দাওয়ার উপর হরিদাসকে এবং ঘরের ভিতরে তিন জনকে বসাইয়া আহার করাইলেন। নিতাই সে দিন ঘরের মধ্যে ভাত ছড়াছড়ি করিয়া বৃদ্ধকে বড় বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। কয়েক দিবস পরে চারি জনে আনন্দ করিতে করিতে পুনরায় নবদ্বীপে ভক্তসমাজে আসিয়া উপস্থিত হন।

পাপের শাসন।

মাতাল দুরাচারীদিগের প্রতি চৈতন্যের বড় দয়া ছিল। এক দিন মদ্য-পায়ীদিগের পল্লীর ভিতর দিয়া আসিতে আসিতে সুরার আঘ্রাণ পাইয়া তিনি শ্রীবাসকে বলিলেন, আমি উহাদের বাড়ীতে যাইব। শ্রীবাস বলিলেন, তাহা হইলে আমি জলে ডুবিয়া মরিব, এমন কর্ম্ম কখন তুমি করিতে পাইবে না। সুরাসক্ত ব্রাহ্মণগণ নিকটে আসিয়া কেহ বলে, নিমাই পণ্ডিত, তোমার নাচ গান আমাদের বেশ ভাল লাগে। কেহ হাতে তালি দিয়া হরি বলিয়া নাচে, কেহ বা সঙ্গে সঙ্গে আসে; সে দিন গৌরকে পাইয়া তাহাদের বড় আমোদ বোধ হইয়াছিল। মদ্যপায়িগণের রঙ্গ ভঙ্গী দেখিয়া গৌর হাসিতে লাগিলেন। উভয়ের মধ্যে অনেক সৌসাদৃশ্য আছে তাই বুঝি এত আকর্ষণ!

সার্ব্বভৌমের পিতা মহেশ্বর বিশারদের জাঙ্গালে দেবানন্দ নামে এক পণ্ডিত থাকিতেন। তিনি এক জন জ্ঞানী শান্তচিত্ত শুদ্ধস্বভাব মোক্ষাভিলাষী, আজন্ম উদাসীন্। তাঁহার ভক্তি ছিল না, অথচ তিনি ভাগবত পাঠ করিতেন; সুতরাং তাহার ভাবার্থ বোধগম্য হইত না। চৈতন্য এক দিন এই বিপ্রের ভাগবত পাঠ শুনিয়া যৎপরোনাস্তি বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভাগবতের ন্যায় পীযুষপরিপূরিত গ্রন্থ কঠোর মায়াবাদীর হস্তে কলঙ্কিত হইবে, ইহা তাঁহার পক্ষে অসহ্য। ভাগবত তাঁহার পরম আদরের ধন ছিল, সর্ব্বদা তিনি তাহার শ্লোক আবৃত্তি করিতেন এবং অপর ভক্তমুখে তাহা শুনিতেন। কিছু দিন পরে পথে দেখা পাইয়া দেবানন্দকে তিনি বড় ভৎর্সনা করেন। তাহার কারণ এই যে, অনেক দিন পূর্ব্বে একবার শ্রীবাস এই ব্রাহ্মণের নিকট ভাগবত শুনিতে যান। শ্রীবাস ভক্তিপথের লোক কি না, রসময়ী ভাগবতকথা শুনিয়া তিনি ভাবে মগ্ন হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, ভাবাবেশে তাঁহার চিত্ত বিহ্বল হইল। চিরকৌমার্য্যব্রতধারী দেবানন্দ ভাগবত পড়েন কেবল ঐ পর্য্যন্ত, কখন ভাবও হয় না, এ প্রকার ভাবাবেশ কখন কাহারো হইতে দেখেনও নাই; শ্রীবাসের ঘন ঘন নিশ্বাস ও ক্রন্দনের শব্দে পাঠের ব্যাঘাত জন্মিতে লাগিল, কেহ কিছু শুনিতে পায়

না দেখিয়া দেবানন্দের ছাত্রগণ মহা বিরক্ত হইল। পরিশেষে শ্রীবাসকে ধরাধরি করিয়া সকলে দূরে ফেলিয়া আসিল। দেবানন্দও কিছু নিষেধ করিলেন না। ক্ষণকাল পরে শ্রীবাস চেতনা পাইয়া অতিশয় ব্যথিত হন। এই ব্যাপার চৈতন্য জানিতেন, তজ্জন্য দেবানন্দকে অনেক তিরস্কার করিলেন। সে ব্রাহ্মণ আর না রাম, না গঙ্গা, মলিন মুখে অধোবদনে আপনার আশ্রমাভিমুখে চলিয়া গেল। চৈতন্য যাহা বলিলেন সে কথা ভুলিবার নহে, দেবানন্দের মন তাহাতে আন্দোলিত হইতে লাগিল, তিনি লজ্জিত হইলেন। লজ্জার বিষয়ও বটে। কত সাধ্য সাধনা করিয়া একটু ভক্তির ভাব কত লোকে পায় না, তাহার প্রতি এত অবহেলা! দেবানন্দ অতিশয় অনুতপ্ত হইলেন। কিছু দিন পরে এক জন বৈষ্ণবের সাহায্যে তিনি চৈতন্যের প্রসাদ প্রাপ্ত হন।

কোন সাধুকে কেহ অপমান করিলে চৈতন্য তাহাকে সহজে ছাড়িতেন না। দুর্ব্বাসা ঋষি যেমন রাজর্ষি অম্বরীষকে বিনা অপরাধে অভিসম্পাত করিয়া শেষ মহা বিপদ্‌গ্রস্ত হন, সুদর্শন চক্রের ভয়ে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের নিকট গিয়া কাঁদিয়া পড়েন, শেষ ভগবানের আদেশে অম্বরীষের আশীর্ব্বাদ প্রসন্নতার ভিখারী হইয়া বৈষ্ণবাপরাধ হইতে নিষ্কৃতি পান; বিশ্বম্ভর ঠিক অনেকের সম্বন্ধে এই প্রণালী অবলম্বন করিতেন। যাঁহার নিকট অপরাধ তাঁহাকে প্রসন্ন না করিয়া যদি মহা যাগ যজ্ঞ তপস্যা কর ঈশ্বর তাহা গ্রাহ্য করিবেন না, এ কথা তিনি নিজমুখে দুর্ব্বাসাকে বলিয়া দিয়াছিলেন। এমন কি, চৈতন্য শচীর প্রতিও এই ব্যবস্থা প্রয়োগ করেন। বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হইলে কিছু দিন পরে বিশ্বম্ভরও অদ্বৈতের নিকট যখন যাতায়াত করিতেন, গৃহধর্ম্মে মন দিতেন না, তখন শচী বিরক্ত হইয়া অদ্বৈতকে কটু কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহার সংস্কার ছিল যে, ঐ বৃদ্ধই আমার সন্তান দুইটিকে গৃহত্যাগী করিয়াছে। স্ত্রীজাতি সহজে উতলা, মনের দুঃখে অদ্বৈতকে তিনি অনেক কুকথা বলিয়া ফেলেন। এ জন্য গৌর মাতাকে দিয়া আবার অদ্বৈতের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করান। এই উপলক্ষে বৈষ্ণবাপরাধ-ভঞ্জন সকলকে তিনি শিক্ষা দিয়াছিলেন।

শ্রীবাসের শাশুড়ীর মত আর একজন ব্রহ্মচারীরও একবার সেই দশা ঘটিয়াছিল। ইনি চৈতন্যের নৃত্য দেখিবার জন্য অতিশয় ব্যাকুল হন; শ্রীবাসকে অনেক বলিয়া কহিয়া এক দিন তাঁহার গৃহে লুকাইয়া থাকেন।

শ্রীবাস ভাবিলেন, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী ফলমূলাহারী শুদ্ধসত্ব লোক, কীর্ত্তন শুনিবে ইহাতে বোধ হয় কোন দোষ নাই; তাঁহাকে লুকাইয়া থাকিতে বলিলেন। সন্ধ্যা হইলে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল, কিন্তু সে দিন ভাবের জমাট আর বাঁধে না; ব্রহ্মচারী তথায় লুকাইয়া আছেন, শ্রীবাসকে তখন সে কথা বলিতে হইল। চৈতন্য বলিলেন, বাহির কর উহাকে! কেবল পয়ঃপান করিলে হরিভক্তি হয় না। আত্মত্যাগী শরণাগত দাস ভিন্ন সে বস্তু কেহ পায় না। ব্রাহ্মণ হরিধ্বনি শুনিয়া এবং নৃত্য দর্শন করিয়া গলিয়া গিয়াছিল, শচীকুমারের অগ্নিময় উপদেশ বাক্য শ্রবণে তৎক্ষণাৎ বাহির হইল, এবং তাঁহার ভর্ৎসনা তাড়নাকে পাপের দণ্ডস্বরূপ মনে করিয়া লইল। গৌরচন্দ্র ব্রাহ্মণের দীনতা দেখিয়া সন্তুষ্টচিত্তে শেষ বলিলেন, তুমি তপস্যার অহঙ্কার করিও না, কিন্তু বিষ্ণুভক্তি সর্ব্বোপরি মনে করিবে। ব্রহ্মচারী কৃতার্থ হইল, সাধু বৈষ্ণবগণ হরিধ্বনির সহিত আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

এই সময় হরিসঙ্কীর্ত্তন প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যের দেবপ্রভাব সমস্ত নবদ্বীপে বিস্তার হইয়া পড়ে। শচীর গৃহ প্রতি দিন শত শত নর নারী যাত্রী দ্বারা পূর্ণ হইতে লাগিল। বিবিধ উপহার পুষ্পমালা লইয়া মহাপ্রভুকে সকলে দেখিতে আসিত, এবং গোপনে আসিয়া রাত্রিকালে তাহারা কীর্ত্তন শুনিত। পাষণ্ডীদিগের দৌরাত্ম্যে গৌরাঙ্গ শ্রীবাসের বহির্দ্বার বদ্ধ করিয়া রাখিতেন, ইহাতে অনেক ভক্তিপিপাসু নির্দ্দোষস্বভাব ব্যক্তিরাও বঞ্চিত হইত। সেই সমস্ত লোক চৈতন্যের গৃহে গিয়া উপদেশ শুনিতে লাগিল। তিনি তাহাদিগকে স্নেহের সহিত এই শিক্ষা দিতেন যে, তোমরা সপরিবারে মহামন্ত্র হরিনাম জপ কর, ইহাতেই তোমাদের আশা পূর্ণ হইবে, সর্ব্বদা এই নাম লইবে, আর প্রতিবাসী দশ পাঁচ জনে মিলিয়া, দ্বারে বসিয়া করতালি দিয়া নিত্য হরিনাম কীর্ত্তন করিবে।

হরিভক্তির জয় ও নগরসঙ্কীর্ত্তন।

গৌরাঙ্গের আদেশানুসারে প্রতি দিন সন্ধ্যাকালে নগরবাসিগণ মৃদঙ্গ মন্দিরা করতাল শঙ্খ বাজাইয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিল। ঘরে ঘরে হরিনাম আরম্ভ হইল। প্রেমিক নিমাই নিজেও কখন কখন গিয়া তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিতেন, আপনার গলার মালা খুলিয়া তাহাদের গলায় পরাইয়া দিতেন, বিনীতভাবে দন্তে তৃণ করিয়া ভাই সকল! সর্ব্বদা হরি হরি বল, এই বলিয়া অনুরাগভরে দ্বারে দ্বারে সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার উৎসাহ ব্যাকুলতা অনুরাগ দর্শনে নদীয়াবাসী লোক সকল মাতিয়া উঠিল। সন্ধ্যাকালে চারিদিকে বাদ্যনিনাদ তৎসঙ্গে গভীর হরিধ্বনি, তাহা শুনিতেই এক আমোদ। প্রবল পবনসংযোগে হুতাশন যেমন সহস্র জিহ্বা বিস্তার করিয়া নিমেষের মধ্যে শত শত বাসগৃহ দগ্ধ করিয়া ফেলে, তেমনি দেখিতে দেখিতে গৌরের হরিপ্রেমানল হৃদয়ে হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিল; এক স্থানে নির্ব্বাণ করিতে গেলে আর দশ স্থানে ধূ ধূ করিয়া সে আগুন জ্বলিয়া উঠে। সংক্রামক রোগের ন্যায় তাহা নানাদিকে অল্পকাল মধ্যে বিস্তার হইয়া পড়িল। এত দিন যে অগ্নি প্রচ্ছন্নভাবে কতকগুলি ভক্তের মধ্যে বদ্ধ ছিল, এক্ষণে তাহা নানা স্থানে দেখা যাইতে লাগিল। চৈতন্যের এই প্রভুত প্রভাব দর্শনে রাজপুরুষ ও প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ মহা প্রমাদ গণিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণেরা কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারে না, অথচ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রাধান্য গৌরব ইহাও সহ্য হয় না; ঘোর বিপদে পড়িল, হিংসা বিদ্বেষের আগুনে তাহারা দগ্ধ হইতে লাগিল।

যে যে পথে বৈষ্ণবগণ নৃত্য করিয়া নামকোলাহল করিতেন, এক দিন কাজি নগরের সেই পথ দিয়া যাইবার সময় সে সমস্ত শুনিতে পাইলেন। মহা কোলাহল রব শ্রবণে তিনি আস্ফালন করিতে করিতে তাহাদিগের পানে ধাবিত হইলেন; ভয়ে কে কোথায় পলাইয়া গেল, কেহ বা পদাতিকের হস্তে দুই চারি আঘাতও খাইল। কাজি তাহাদের মৃদঙ্গ ভাঙ্গিলেন, এবং ভয় দেখাইয়া বলিয়া দিলেন, যদি পুনরায় এরূপ

দেখি, তবে আমি তোমাদের জাতি নাশ করিব, ধরিয়া বাঁধিয়া লইয়া যাইব, আজ ক্ষমা করিলাম। এ সময়ে সৈয়েদ্ হোসেন সাহা গৌড়ের সিংহাসনে বিরাজ করিতেন। তদনন্তর বিরুদ্ধবাদী দুষ্টমতি জন কতক লোক সঙ্গে লইয়া কাজি পথে পথে কয়েক দিন ভ্রমণ করেন, সুতরাং নগরবাসিগণ তাঁহাদের ভয়ে লুকাইয়া থাকে। দুর্ব্বলচিত্ত নবানুরাগী বৈষ্ণবগণ প্রকাশ্যে আর বড় কিছু করিতে পারে না। তখন পরিণামদর্শী ভীরুস্বভাব অল্পবিশ্বাসী ও বিরোধী ব্যক্তিরা বলিতে লাগিল, হরিনাম লইবে মনে মনে লও, পথের মাঝে গণ্ডগোল চীৎকার না করিলে কি আর হয় না ? কোন্ পুরাণে এমন কথা আছে? বেদবাক্য লঙ্ঘন করিলে এইরূপ শাস্তি হয়। ইহাদের জাতি যাইবে বলিয়াও কি ভয় নাই ? এবার নিমাই পণ্ডিতের অহঙ্কার চূর্ণ হইবে। নিত্যানন্দ যে করিয়া বেড়ান, কোন্ দিন বা তাঁহার প্রাণ যায় দেখ। ভক্ত বৈষ্ণবগণ এ সব কথার আর কোন উত্তর দিতে পারে না, আতঙ্কে সকলে জড়সড় হইল। চৈতন্য সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিলেন, ভীরু নিপীড়িত হরিভক্তেরা তাঁহাকে দুঃখের বিবরণ সকল জানাইল। তখন নবাবি আমল, যেখানে যে রাজকর্ম্মচারী থাকিত, সেইখানে তাহার একাধিপত্য ছিল। ব্রাহ্মণ এবং সম্ভ্রান্ত পণ্ডিত লোকেরা চৈতন্যের বিরোধী, অধিকন্তু কাজিও বিরোধী হইয়া উঠিল। কিন্তু চৈতন্য কিছুতেই ভীত বা নিরুদ্যম হইবার লোক নহেন ; বিরুদ্ধাচার শুনিয়া তাঁহার উৎসাহাগ্নি আরও জ্বলিয়া উঠিল ; সকলকে আজ্ঞা দিলেন অদ্য সন্ধ্যাকালে নগরের পথে পথে সঙ্কীর্ত্তন হইবে। এ কথা শুনিয়া ভক্তগণ মহা আনন্দে পুলকিত হইলেন। স্নান আহার বন্ধ হইয়া গেল, উৎসাহের সহিত সকলে কীর্ত্তনের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

এই প্রথম নগরসঙ্কীর্ত্তন, অতি সমারোহের সহিত ইহা সম্পন্ন হইয়াছিল। এ প্রকার সঙ্কীর্ত্তন প্রণালী গৌরাঙ্গদেবই প্রথমে প্রচলিত করেন। পথে কীর্ত্তন বাহির হইবে, ভক্তগণ সঙ্গে লইয়া বিশ্বম্ভর নৃত্য করিবেন, এই সংবাদ পাইয়া নগরবাসী নরনারী বালক বালিকা যুবা বৃদ্ধের মন যেন একবারে মাতিয়া উঠিল। অধিবাসীদিগের চিত্ত মহা কৌতূহলাক্রান্ত হইল। চৈতন্য পূর্ব্ব হইতেই কে কোন্ দলে নাচিবে, কে কাহার সঙ্গে গাইবে সমস্ত ঠিক করিয়া দিলেন। সর্ব্বাগ্রে আচার্য্য গোসাঞী

নৃত্য করিবেন তাঁহার সঙ্গে এক দল গায়ক থাকিবে। দ্বিতীয় দলে হরিদাস নাচিবেন তাঁহার সঙ্গে আর এক দল লোক কীর্ত্তন গাইবে। তৃতীয় দলে শ্রীবাস পণ্ডিত অন্য এক দল গায়কের সহিত নাচিবেন। এইরূপ স্থির হইল। নিত্যানন্দের পানে চাহিবা মাত্র তিনি বলিলেন, প্রভু, আমি একাকী নৃত্য করিতে পারিব না, তোমার সঙ্গে থাকিব। গৌর তাঁহাকে আলিঙ্গন দিয়া আপনার নিকটে রাখিলেন। তদনন্তর গোধূলি সময়ে শত সহস্র লোক একত্রিত হইয়া মশাল জ্বালিল। প্রত্যেকের হস্তেই এক একটি আলোক, তাহাতে চতুর্দ্দিক দিবালোকের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল; এবং মৃদঙ্গ করতাল সহ গম্ভীর হরিধ্বনি গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। সকলে বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছেন এমন কালে গৌরসিংহ ভীম গর্জ্জনে হরিনামের হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। সেই ভীষণ ধ্বনি তড়িতের ন্যায় সকলের অন্তরে প্রবিষ্ট হইল। সেনাপতির আদেশে সৈন্যগণ যেমন রণক্ষেত্রে অগ্রসর হয়, তদ্রূপ সকলে উৎসাহ উদ্যমে মাতিয়া উঠিল। পশুরাজ সিংহের ঘোর গর্জ্জনে শৈলকন্দর যেরূপ প্রতিধ্বনিত হয়, চৈতন্যের শ্রীমুখবিনিঃসৃত সেই হরিধ্বনিতে তেমনি ভক্তবৃন্দের চিত্তগুহায় প্রতিধ্বনির তরঙ্গ উঠিল। এইরূপে ভক্তগণ সমরকুশল মহাপরাক্রমশালী বীরের ন্যায় বিজয়নিশান হস্তে লইয়া দলে দলে হরিনাম গান করিতে করিতে রাজপথে বহির্গত হইলেন। তাঁহাদের গলে পুষ্পমালা, বক্ষে ও ললাটে চন্দনরেখা, এবং দেবতুল্য উজ্জ্বল অঙ্গশোভা দর্শনে বোধ হইতে লাগিল যেন ধরাতলে শত শত তারকা উদিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে পূর্ণশশধরের ন্যায় গৌরসুন্দর কনকবিনিন্দিত ভুজযুগল উত্তোলন করিয়া মৃদু মন্দ গমনে নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার প্রফুল্লকমলসদৃশ প্রেমবিকসিত মুখমণ্ডলে মধুর হাস্যদ্যুতি নিরন্তর শোভা পাইতেছিল; এবং সন্তপ্ত হৃদয় অনাথ দীনজনের মস্তক রাখিবার স্থল তাঁহার সেই সুশীতল বিশাল বক্ষ অগুরুচন্দনে চর্চ্চিত হইয়া যেন পাপভারাক্রান্ত জীবদিগকে সস্নেহে নিমন্ত্রণ করিতেছিল। কি অপরূপ সে লাবণ্য! প্রিয়তম গৌরচন্দ্রের সুকোমল হস্ত যাহার দেহকে একবার স্পর্শ করিয়াছে তাহার ভব যন্ত্রণা তিরোহিত হইয়াছে। তাঁহার কণ্ঠে সুবাসিত মালতীকুসুমমালা দোদুল্যমান, স্কন্ধে রজতোজ্জ্বল শুভ্র যজ্ঞসূত্র, সুদীর্ঘ স্থূল কোমলাঙ্গ, প্রশস্ত ললাট দর্শনমাত্র হৃদয়সিন্ধু মহাবেগে উদ্বেলিত হইয়া উঠে। তাঁহার সেই

কমলনয়নের অবিরল প্রেমধারা, হরিনামের বিশাল ঘন গর্জ্জন, মনোহর পাদবিক্ষেপ, সমীরণবিতাড়িত সুন্দর অলকদাম, তেজোময় দেহকান্তি; অদ্বৈত হরিদাসাদি প্রমত্ত ভক্তগণের উন্মাদবৎ নৃত্য; পারিষদগণের উল্লাসকর গভীর স্বরলহরী কালের আবরণ ভেদ করিয়া যেন এখনও পর্য্যন্ত চিত্তকে বিচলিত করিয়া তুলিতেছে। সেই অদৃশ্যপূর্ব্ব নগরসঙ্কীর্ত্তনের মনোহর বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেও শরীর রোমাঞ্চিত, নয়ন বাষ্পবারিতে পরিপূর্ণ হয়। এইরূপে গৌরচন্দ্র যখন সহস্র সহস্র লোক সমভিব্যাহারে হরিনামসুধা বিতরণ করিতে করিতে চলিলেন, তখন বোধ হইল যেন স্বর্গের দেবতাগণ মহীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যে যে স্থান দিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন সেখানকার লোকদিগের বুকের উপর দিয়া প্রবল বেগে একটি বান ডাকিয়া গেল, মেদিনী কাঁপিতে লাগিল। অদ্বৈত, হরিদাস, শ্রীবাস তিন দলের অগ্রে অগ্রে নৃত্য করিতে করিতে চলিলেন; সকলের পশ্চাতে চৈতন্যদেব, তাঁহার এক দিকে নিত্যানন্দ অপর দিকে গদাধর। ইচ্ছা হয় জ্বলদক্ষরে সেই রূপের বিচিত্র ছবি চিত্তপটে অঙ্কিত করিয়া অনিমেষ নয়নে দর্শন করি; এবং তদ্দ্বারা হৃদয়ের ক্ষোভ নিবৃত্ত করি। কিন্তু তাহার প্রকৃত ছবি মনে আসিলে চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে, জীবনের গতি স্থগিত হয়; অনুভব করিলে লিখিতে পারি না, লিখিতে গেলে সে শোভা অন্তর্হিত হয়।

দিক্ আলোকময় করিয়া সুগম্ভীর নাদে হরিগুণ গান করিতে করিতে গঙ্গার স্রোতের ন্যায় রাজপথ বহিয়া সকলে চলিলেন। ভক্তগণের পদসঞ্চালনে রাশি রাশি ধূলি উড্ডীন হইয়া নভমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল, নারীগণ মঙ্গলধ্বনি করিতে লাগিল। সকলের মুখেই হরিনাম। যে কখন কোন কালে গান করে নাই সেও গান করিতেছে! উৎসাহে যেন অগ্নি বৃষ্টি হইতেছে। কীর্ত্তনে কীর্ত্তনে প্রতিঘাত হইয়া চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনির তরঙ্গ উঠিল। প্রজ্জলিত ভাবাবেশে উন্মত্ত ভক্ত চূড়ামণি গৌরচন্দ্র পথিমধ্যে কখন ধূলিধূষরিত হইয়া তদুপরি অজস্র প্রেমবারি বর্ষণ করিতেছেন, কখন পুলকে কদম্বাকৃতি হইয়া মূর্চ্ছিত হইতেছেন, কখন প্রমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক বল হরি! বল হরি! বলিয়া সকলকে মাতাইয়া তুলিতেছেন। তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া সহজ মানুষ পাগল হইয়া যায়। সে নৃত্য, সে কীর্ত্তন, সে উৎসাহ যাহারা একবার দেখিল তাহাদের বুক ভাঙ্গিয়া গেল।

শেষ তিন দল হইতে শত শত দল প্রস্তুত হইল; কে কোথায় গায়, কে কোথায় নাচে, যেন একটা প্রকাণ্ড মেলা। সকলেই উন্মত্ত, কেহ যে কাহারো গান শুনিবে সে পথ নাই, প্রত্যেকেই গাইতেছে। অতি ভয়ঙ্কর কোলাহলধ্বনি! এক্ষণকার সভ্য বাবুরা হইলে হয়ত বলিতেন, মস্তিষ্ক গলিয়া যাইবে চল পলায়ন করি। না হয় পাগলাগারদে ইহাদিগকে পাঠাইবার পরামর্শ দিতেন। কিন্তু গৌরাঙ্গের নৃত্য কীর্ত্তনে সে দিন পাষণ্ড দলন হইয়াছিল। লম্পট দুরাচারীরা ধূলায় লুটাইতে লাগিল। কত লোক যে দেখিতে আসিয়াছিল তাহা গণিয়া ঠিক করা যায় না। তখন নবদ্বীপে বিস্তর লোকের বসতি ছিল। বিষ্ণুভক্তগণ আপনাদের গৃহদ্বার কদলীবৃক্ষ, পূর্ণকুম্ভ, আম্রশাখা, ও পুষ্পমালা দীপাদি দ্বারা শোভিত করিয়াছেন, এ সকল দেখিয়া ভক্তগণের উৎসাহানল ক্রমেই জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। এক এক জনের অগ্নিময় মূর্ত্তি অবলোকনে প্রাণ যেন কাঁপিয়া যায়। বৃদ্ধ অদ্বৈত সে দিন কত রঙ্গেই যে নাচিয়াছিলেন তাহা আর বলা যায় না।

ভক্তগণ এই ভাবে মত্ত হইয়া গঙ্গাপুলিনের পথে চলিলেন। ইহার ভিতর আবার চঞ্চলমতি বাহ্য উৎসাহী অনেক যুবা আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। তাহাদের উৎসাহ যথেষ্ট বটে, কিন্তু তাহার গতি অন্য দিকে। কেহ পাষণ্ডীদিগকে ধরিতে যায়, কেহ তাহাদিগকে ভয় দেখায়, কেহ মাটিতে কিল মারে, দন্ত ঘর্ষণ করে, বিরোধীদিগের ঘরের চাল ধরিয়া টানে; উৎসাহের সঙ্গে তাহারা দয়া ভক্তি বিনয় যোগ করিতে পারে নাই। আবার অন্য দিকে প্রেমোন্মত্ত ভক্তগণ কেহ কাহারো স্কন্ধে উঠিতেছেন, কেহ কাহার পায়ের ধূলা গ্রহণ করিতেছেন, কেহ গড়াগড়ি দিতেছেন, কেহ মুখে এবং বগলে বাদ্য বাজাইতেছেন, কেহ কোলাকোলি করিতেছেন, কেহ কাহার চরণে পড়িয়া কাঁদিতেছেন, কেহ গাছের ডাল ভাঙ্গিতেছেন; কেহ বলিতেছেন, আমি নিমাই পণ্ডিত, জগৎ উদ্ধার করিতে আসিয়াছি! যাহারা নিতান্ত উদ্ধতপ্রকৃতির যুবা তাহারা বলিতে লাগিল, সে কাজি ব্যাটা আজ কোথা? নানা ভাবের আবির্ভাব, সমস্ত লিখিয়া উঠা যায় না। ভক্তদিগের মত্ততা দর্শনে বিরোধী হিন্দুগণ হিংসানলে পুড়িতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে কেহ বলে, এই সময় যদি কাজির লোক আসে তাহা হইলে বেশ মজা হয়! সব ব্যাটা পলায়। কেহ বলে আমি ভাই তাহা হইলে উহাদিগকে ধরিয়া দিব। কেহ

বলে চল কাজিকে ডাকিয়া আনি, তবেই ইহারা সব পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া কে কোথায় সরিয়া পড়িবে। আর একজন বলিল না ভাই, তাহাতে কাজ নাই, মিথ্যা করিয়া বলি চল যে, ঐ কাজি আসিতেছে! ভাবুক বৈরাগীর দল তাহা হইলে এখনি শুনিয়া ভয়ে মরিবে। সে দিন কিসের বা ভয়, আর কাহার কথা কে বা শুনে, সমস্ত লোক হরিনামে একেবারে মাতিয়া উঠিয়াছে। চৈতন্য আপনি কাঁদিয়া নয়নজলে সকলকে ভাসাইতেছেন। সে বেগ যে প্রতিরোধ করিতে পারে সে সামান্য পাষণ্ড নহে। গৌরের সেই প্রেমবিগলিত নেত্র, উর্দ্ধ বাহুযুগল, ভাবময়ী তনু, অপূর্ব্ব মুখশ্রী মনে হইলে এখনও আমাদের প্রাণ ব্যাকুল হয়।

"তুয়ার চরণে মন লাগুহু রে শারঙ্গধর, তুয়ার চরণে মন লাগুহু রে" এই গান ধরিয়া গঙ্গার ধারের পথে যাইতে যাইতে জীবন্মুক্ত মাধাইয়ের ঘাটে ক্ষণ কাল দণ্ডায়মান হইয়া সকলে কীর্ত্তন করিলেন। তদনন্তর কাজির বাড়ীর পথে কীর্ত্তনের দল প্রবেশ করিল। দূর হইতে ভীষণ বাদ্যনাদ শ্রবণে কাজি তত্ত্ব জানিবার জন্য দূত পাঠাইলেন। দূত কিছু দূর আসিয়া দেখিয়া ফিরিয়া গিয়া বলিল, খোদাবন্দ! বড় বিষম ব্যাপার! লক্ষ লক্ষ লোকসঙ্গে নিমাই পণ্ডিত আসিতেছে, সে বামণকে দেখিলে ভয় হয়। সহস্র সহস্র মশাল জ্বলিতেছে, গান বাদ্যের শব্দে কাণ যেন খসিয়া পড়ে। বলিতে বলিতে বন্যার স্রোতের ন্যায় চৈতন্যের সৈন্যদল কাজির দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। কাজি স্বগণসহ ভয়ে প্রস্থান করিলেন। চঞ্চলমতি যুবক দল মহা উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা কি করিবে তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে না। কেহ কাজির ঘর ভাঙ্গে, কেহ বাগান উজাড় করে, কেহ বাড়ীর মধ্যে যায়, কেহ হাঁক মারে; মহা তুমুল কাণ্ড উপস্থিত করিল। অবোধ লোক সকল গৌরের আন্তরিক ভাব বুঝিতে পারে না, তাহারা মনে করিল বুঝি তিনি কাজিকে প্রহার করিতেই আসিয়াছেন। তাঁহার বল ও প্রশ্রয় পাইয়া সকলে আপনাদের নষ্ট বুদ্ধির পরিচয় দিতে লাগিল। কাজির লোক জন কতক কীর্ত্তনের দলে মিশিয়া কপটভাবে হরি হরি বলিয়া হাততালি দিতে লাগিল। যাহার দাড়ি ছিল সে মুখ নামাইয়া লুকাইয়া রহিল। বিস্তর লোক, ভয়ানক সমারোহ, কেই বা তাহাদিগকে চিনিয়া বাহির করিবে! উৎসাহে আপনাকেই আপনি

সকলে ভুলিয়া গিয়াছিল চিনিতে পারে নাই, অন্যকে আর তবে কিরূপে চিনিবে! তদনন্তর গৌর কাজিকে ডাকাইলেন। সে ব্যক্তি তখন ভয়ে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছে। কাজি গৌরকে বলিল, তোমার নানা নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীকে আমি চাচা বলিতাম, অতএব তুমি আমার ভাগনা হও, এক্ষণে আমার অপরাধ ক্ষমা কর। গৌরচন্দ্র তাঁহাকে সম্মান করিয়া বসাইয়া আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, তোমার বাড়ীতে আমরা অতিথি হইলাম, আর তুমি লুকাইয়া রহিলে? এক্ষণে আমার দুইটী ভিক্ষা। দুগ্ধবতী গাভী মাতা, বৃষগণ পিতাস্বরূপ হইয়া শস্য উৎপাদন করে, ইহাদিগকে তোমরা আহার করিও না। আর নবদ্বীপের মধ্যে কীর্ত্তন যেন বন্ধ না হয়। কাজি বলিল, গোমাংস ভক্ষণ আমাদের ধর্ম্ম, সঙ্কীর্ত্তনসম্বন্ধে আমি বলিয়া দিয়াছি, আমার বংশে কেহ কখন উহার উপর হস্তক্ষেপ করিবে না। তোমাদের হিন্দুরাই ইহার বিরুদ্ধে আমার নিকট আসিয়া অভিযোগ করিয়াছিল, আমার কিছু অপরাধ নাই। কাজির সঙ্গে ক্ষণকাল ধর্ম্মালাপ করিয়া চৈতন্য মহাপ্রভু কীর্ত্তন করিতে করিতে বণিক্ ও তন্তুবায়পল্লী ঘুরিয়া গাদি-গাছা, পারডাঙ্গার ভিতর দিয়া দরিদ্র শ্রীধরের গৃহে উপস্থিত হইলেন। অত্যন্ত পিপাসার্ত্ত হইয়াছিলেন, তথায় একটি ভগ্ন লৌহপাত্রে জল ছিল, তাহাই পান করিলেন। তদ্দর্শনে শ্রীধরের আর আনন্দের সীমা রহিল না। গরিব ব্রাহ্মণ একেবারে মোহিত হইয়া গেল। গৌর বলিলেন, অদ্য আমি শুদ্ধ হইলাম। তোমার জল পান করিয়া অদ্য হরিপদে আমার ভক্তি জন্মিল, আমি ধন্য হইলাম। এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার নয়নযুগলে প্রেমধারা বহিতে লাগিল। সমস্ত ভক্তগণ শ্রোতৃবর্গ ভাবরসে ডুবিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সে দিন অজস্র ধারে ভক্তিস্রোত বহিয়াছিল। পরে সেই ভগ্ন লৌহপানপাত্রে সকলেই জল পান করিলেন। শ্রীধর কৃতার্থ হইয়া গেলেন, তাঁহার দুই চক্ষে জল ঝরিতে লাগিল। শ্রীধরের উঠানে নৃত্য সঙ্কীর্ত্তন করিয়া, নানা স্থান ঘুরিয়া ভক্তগণ নগরকীর্ত্তন সমাপ্ত করেন। মনুষ্য যে কি বস্তু তাহা এই মানুষরতন গৌরকে দেখিলে কতক চিনিতে পারা যায়। আহা! যে জীবনে ঈশ্বরের আবির্ভাব হয় তাহা কি সামান্য পদার্থ? ভগবান্ এই সকল ব্যক্তিকে ধরাতলে পাঠাইয়া বলিয়া দেন যে, মনুষ্যকে

এইরূপ হইতে হইবে, এবং ইহা মানবজীবনের আদর্শ। কি চমৎকার সুখের সাধুসঙ্গই ছিল! গৌরসহবাসের পবিত্র বায়ু অঙ্গে লাগিলে প্রাণ পুলকিত এবং উদাস হইত। এমন এক আশ্চর্য্য আকর্ষণী শক্তি তিনি পাইয়াছিলেন যে, তাহাতে লোকগুলকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। ধন্য শ্রীগৌরাঙ্গ! তোমার চরণে কোটি কোটি প্রণাম।

এক দিকে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের যেমন শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল, চৈতন্যের ভক্তি প্রেমত্ততা তেমনি বাড়িয়া চলিল; তিনি ভক্তিরসময় হইয়া সাধু মহাত্মাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন, হরিনাম শুনিলেই অমনি নাচিয়া উঠিতেন। দিন রাত্রি বৈষ্ণবদিগের সঙ্গে বাস, বাড়ীতে কেবল জননীর অনুরোধে নাম মাত্র এক একবার আসিতেন। ক্রমশঃ প্রেম ঘনীভূত হইয়া তাঁহাকে এমনি মত্ত করিতে লাগিল যে, উপহাসচ্ছলে পথে ঘাটে দুষ্ট বালকগণ হরি বলিয়া হাততালি দিয়া তাঁহাকে উন্মাদ করিয়া তুলিত। এক দিন কয়েকটি বালক গঙ্গাস্নানের পথের মধ্যে এইরূপ করাতে তিনি হতচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন, শচী তাহা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিতা হন।

চৈতন্যের অমায়িকতা।

মহাপ্রভু রজনীতে শ্রীবাসের ঘরে কীর্ত্তন করেন, আর দিবসে ধর্ম্ম-বন্ধুগণের গৃহে গৃহে গদাধর নিত্যানন্দের সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ান। দুঃখী দরিদ্র ভক্তদিগের প্রতি তাঁহার বড় ভালবাসা ছিল। একদিন ভিক্ষুক শুক্লাম্বরকে বলিলেন, অদ্য তোমার গৃহে অন্ন আহার করিতে আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে। ব্রহ্মচারী ইহা শুনিয়া নিতান্ত সঙ্কুচিত এবং ভীত হইলেন। গৌর মহাতেজস্বী সাধু, তাহাতে ব্রাহ্মণ, কিরূপে তিনি অন্ন দিবেন ভাবিতে লাগিলেন। শেষ বন্ধুগণের পরামর্শানুসারে দিব্য গর্ভমোচা ভাতে ভাত আল্গোছে রাঁধিয়া গদাধর, নিত্যানন্দ এবং চৈতন্য তিন জনের পাতে দিলেন। সেই মোচা খাইয়াই বা গৌরের কত আনন্দ! বলিলেন, এমন মিষ্ট সামগ্রী কোথাও কখন খাই নাই! সমস্ত জীবনই মিষ্টরসে পরিপূর্ণ, যাহা ভোজন করেন কাজেই তাহা অমৃততুল্য বোধ হয়, তাহাতে আবার অনুরক্ত ভক্তের হাতে আহার। আহারান্তে গঙ্গাতটবাসী সেই ব্রহ্মচারীর কুটীরে সে দিন শচীনন্দন শয়ন করিয়াছিলেন।

অদ্বৈত আচার্য্যের সঙ্গে নিত্যানন্দের আমোদের কথা যাহা উপরে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা বিবাদ কলহের ন্যায় সাধারণ্যে প্রতীত হইত। এই জন্য কতকগুলি বৈষ্ণব এক জনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া অপরকে নিন্দা করিতেন। উভয়ের মধ্যে বোধ হয় কতকটা দলাদলি ভাব ছিল। বৃদ্ধ আচার্য্য এক একবার কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক নিতাইকে কটু কাটব্য বলিতেন, উলঙ্গ হইয়া পড়িতেন, আবার তাঁহাকে ধরিয়া আলিঙ্গনও করিতেন। ভাবুকের ভাব কে বুঝিবে, কিন্তু ভিতরে একটু বোধ হয় গোলযোগও ছিল। তাহা থাকিলেও এমন আশ্চর্য্য প্রেমবন্ধনে দলটি গঠিত হইয়াছিল যে, তাঁহাদের দাসত্ব করিতে পারিলেও তোমার আমার ন্যায় লোক কৃতার্থ হইয়া যায়। ভক্তদলের মধ্যে নিয়মপ্রণালী, শাসনবিধি কিছু ছিল না, কেহ তাহা জানিতও না, চৈতন্যের প্রেমের ধমক্ এবং স্নেহপূর্ণ মুষ্ট্যাঘাত এ পক্ষে যথেষ্ট কার্য্যকারী ছিল। সকলেই বিনয় ভক্তিতে মাটীতে মিশাইয়া ভক্তের পদধূলি হইয়া থাকিতে চাহেন, এক

অন্যকে ঈশ্বরপ্রেরিত নিত্যসিদ্ধ পুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করেন, অন্য শাসনবিধির প্রয়োজন কি? একা চৈতন্যের প্রেমেই সমুদায় কুভাবকে তাড়াইয়া দিত। তিনি বলিতেন, অদ্বৈত নিতাই যদি যবনীগমন এবং মদ্যপান করেন, তথাপি কেহ ইহাঁদের প্রতি অবিশ্বাসী হইও না। উন্নতশ্রেণীর ভক্তগণের এমন সকল কার্য্য আছে যাহা আপাতদৃষ্টিতে তোমার আমার নিকট দোষাবহ নিকৃষ্টবাসনাপ্রসূত বলিয়া বোধ হয়, কেন না তাঁহাদের অনেক কাজ বেদবিধিবহির্ভূত লোকাচারবিরুদ্ধ; কিন্তু তাহা কদাপি ঈশ্বরেচ্ছার বিপরীত নহে। ক্রীতদাস কি তাহা পারে? অসম্ভব! এই জন্য বিধিবাদী সাধারণ বৈষ্ণবসমাজকে চৈতন্য ঐ কথা বলিতেন। প্রকৃত ভক্তগণ বিধাতার নিগূঢ় নিয়মানুসারে কার্য্য করেন, সাধারণে তাহা অনেক সময় বুঝিতে পারে না। অক্ষর লইয়া তাহারা টানাটানি করে। দৈববলে স্বাভাবিক নিয়মে ভক্তগণ সম্মিলিত হইয়া এই দলটি সঙ্গঠন করিলেন, বিচার যুক্তি পরামর্শ করিয়া করিলে এরূপ কখন হইতে পারিত না। হরিভক্তিরসে বিষম বিসদৃশ ভাব একাকার হইয়া গিয়াছিল। যুগে যুগে কালে কালে ভক্তসঙ্গে ভগবানের এই যে লীলা, ইহা কোন আকস্মিক অন্ধশক্তিপ্রসূত পিতৃমাতৃহীন ঘটনা নহে, বিশ্বের শাসনপ্রণালী নিয়মাবলী ও কার্য্যবিধি প্রস্তুত করিবার সময় এ প্রকার বিধান তিনি তন্মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছেন, যথা সময়ে প্রকটিত হইয়াছে; নতুবা স্বয়ম্ভু নিত্যসিদ্ধ সাধুগণ অনাদিকাল হইতে ঈশ্বরের সঙ্গে আছেন এ কথা আর কি রূপে সত্য হইতে পারে? জীবমুক্তির পক্ষে যে সমস্ত বিধান এবং ব্যবস্থাপ্রণালী প্রয়োজন তাহা কাহা কর্ত্তৃক কোন্ সময় তিনি প্রকাশ করাইবেন, সে সমুদয় ভাব চিন্তা অবশ্য আদি হইতে তাঁহার ভিতরেই ছিল, কেন না তিনি সর্ব্বজ্ঞ পূর্ণ পুরুষ; পরিশেষে যথাসময়ে তাহা মূর্ত্তিমান আকার ধারণ করে।

এই সময় হঠাৎ এক দিন শ্রীবাসের পুত্রটির কাল হয়। পাছে গৌরের কীর্ত্তনের কোন ব্যাঘাত জন্মে এই জন্য তিনি পরিবারস্থ সকলের ক্রন্দন নিবারণ করিয়া আপনি কীর্ত্তনে যোগ দিলেন, দুঃসহ পুত্রশোক সংবরণপূর্ব্বক হরিনাম গানে নিমগ্ন রহিলেন। ক্ষণকাল পরে কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে গৌরসুন্দর এ সমুদায় কথা শুনিয়া অতিশয় মুগ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, কি! আমার অনুরোধে শ্রীবাস পুত্রশোক

সংবরণ করিল? হায়! আমি এমন বন্ধুসহবাস কেমন করিয়া পরিত্যাগ করিব? এই বলিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। "ত্যাগ" শব্দ শুনিয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। মনে সন্দেহ হইল, তবে বুঝি গোসাঞী গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবেন। তদনন্তর ক্রন্দন ক্ষান্ত হইলে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া সকলে মিলে গঙ্গাতীরে চলিলেন। গৌরচন্দ্রও সঙ্গে গিয়াছিলেন। পরে তিনি শ্রীবাসকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, তুমি খেদ করিও না, আমাকে এবং নিত্যানন্দকে তুমি আপনার পুত্র বলিয়া জানিবে। চৈতন্যের প্রগাঢ় সহানুভূতির এই সুমিষ্ট বাক্যে শ্রীবাসের শোক দুঃখ বৈরাগ্য প্রেমে পরিণত হইল, তাঁহার ভ্রাতৃগণ ও পরিবার সকলেই ইহাতে সান্ত্বনা লাভ করিলেন। গৌর নিতাই যাহার নিকট পুত্রত্ব স্বীকার করেন তাহার আর কি সামান্য সন্তানের জন্য শোক মোহ উপস্থিত হয়। শ্রীগৌরাঙ্গের এই সান্ত্বনা বচন কি মধুময়! শ্রীবাসভবনে ভক্তদলের মধ্যে যখন কীর্ত্তনের খুব মাতামাতি, তখন এক জন যবন দর্জি তথায় বস্ত্র শেলাই করিতে আসিত। কথিত আছে যে, চৈতন্যের প্রেমভক্তি দেখিয়া সে যবন বিহ্বল হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিল।
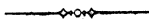
সন্ন্যাস ব্রতগ্রহণ।

অল্প দিন পরেই বিশ্বম্ভরের জীবনপ্রবাহ আর একটি নূতন পন্থা অবলম্বনের জন্য উৎসুক হইল। সংসারে পরিবারমধ্যে এরূপে অবস্থিতি করিলে তাঁহার ধর্ম্ম প্রচারিত হইবে না, জীবের দুর্গতি ঘুচিবে না, লোকের স্বভাব চরিত্র দেখিয়া তৎকালে ইহা তিনি মনে মনে বোধ হয় যথেষ্ট আন্দোলন করিতেছিলেন; আভাসে তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতে লাগিল। যদিও স্পষ্ট কিছু বলেন নাই, কিন্তু ভিতরে প্রভূত আন্দোলন চলিতেছে, ইহা বাহ্য লক্ষণ দ্বারা প্রকাশ হইয়া পড়িল। তিনি গৃহস্থাশ্রমে আছেন বলিয়া যদি লোকে এই সুমিষ্ট ভক্তির ধর্ম্ম গ্রহণে বীতরাগ প্রকাশ করে, এবং সন্ন্যাসী হইলেই জীবের মুক্তির পথ যদি পরিষ্কার হয়, তবে তাহাদের মঙ্গলের অনুরোধে সেই পথই অবলম্বনীয়; এই ভাব এবং হরিপদে একান্ত আত্মসমর্পণের ইচ্ছা তাঁহাকে সর্ব্বত্যাগী দণ্ডধারী করে। এই উপলক্ষে পারিষদবর্গকে বৈরাগ্য শিক্ষা দেওয়াও বোধ হয় অন্যতর উদ্দেশ্য ছিল। নিতান্ত শোকাবহ ব্যাপার বলিয়া সহসা সে সঙ্কল্প ব্যক্ত করেন নাই, কিন্তু দিন দিন তাঁহার চিত্ত ক্ষিপ্তের ন্যায় হইয়া উঠিল। কখন গোপী গোপী জপ করিতেন, কখন কৃষ্ণকে চোর দস্যু বলিয়া তিরস্কার করিতেন; এ সকল প্রেমবিকার আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

নবদ্বীপের অধ্যাপক ও টোলের ছাত্রগণ তাঁহার হৃদয়ে অত্যন্ত বেদনা দিত। জ্ঞান ধর্ম্মের উচ্চাসনে বসিয়া যাহারা সাধারণ জনসমাজকে পরিচালিত করে, তাহাদের কপট ধর্ম্মভাব, কঠোরতা, অবিশ্বাস, অভক্তি, দেবাবমাননা দেখিলে প্রকৃত বিশ্বাসী ও কোমলহৃদয় ভক্ত মহাপুরুষদিগের মনে যেরূপ ক্লেশ দুঃখ উৎপন্ন হইতে পারে চৈতন্যের তাহা যথেষ্ট হইয়াছিল। ধর্ম্মযাজক শাস্ত্রী আচার্য্য গুরুদিগের দুর্ব্ব্যহার দর্শনে একেবারে তিনি নিরাশ হইয়াছিলেন। তাহারা নিজেও ভাল হইবে না, অন্যকেও ভাল হইতে দিবে না, অথচ ধর্ম্ম জ্ঞান শাস্ত্র বিধি লইয়া লোকের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবে, ইহা কি ভক্তিরসময়

গৌরাঙ্গের কোমল প্রাণ সহ্য করিতে পারে? এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া তিনি দেশত্যাগ করিলেন। সন্ন্যাসী হওয়ার পর অনেক বিরোধীও তাঁহার মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিল। এই সময় কেশব ভারতী এক দিন নবদ্বীপে আসেন, বিশ্বম্ভর তাঁহাকে আপনার আলয়ে লইয়া গিয়া সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসগ্রহণের কোন কথা গোপনে তাঁহার সঙ্গে হইয়াছিল কি না তাহা অপর কেহ জানিতে পারে নাই। সেই উন্মত্ত প্রেমাবস্থায় চৈতন্য এক দিন বিষ্ণুপূজা করিতে যান, এমনি অন্তরের বিরহ ব্যাকুলতা, এবং ভাবের প্রচুরতা যে, নয়নজলে তাঁহার পরিধেয় বসন ভিজিয়া গেল। তিন বার বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলেন তিন বারই যেন স্নান করিয়া উঠিলেন; শেষ পরাস্ত হইয়া গদাধরকে বলিলেন, আজ তুমি পূজা কর, আমার ভাগ্যে আর ঘটিল না।

একদা প্রেমবিকারে উন্মাদপ্রায় হইয়া গৌর বিশ্বম্ভর "গোপী" "গোপী" এই নাম জপ করিতেছেন। নিকটে এক জন টোলের ছাত্র বসিয়াছিল, ভক্তের বিচিত্র ভাব সে কি বুঝিবে? বলিল, হে নিমাই পণ্ডিত! তুমি গোপী গোপী কেন বলিতেছ, কৃষ্ণনাম কেন বল না? কৃষ্ণনাম লইলে পুণ্য হয়, তাহাই বল। টোলের ছাত্রেরা কি ধাতুর লোক তাহা চৈতন্য বিলক্ষণ জানিতেন। এ কথা শুনিয়া তিনি উত্তর করিলেন, সেই দস্যু কৃষ্ণকে কে ভজে? তাহাকে ভজিলে কি হইবে? এই বলিয়া কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করত এক খণ্ড যষ্টি হস্তে লইয়া ছাত্রের পশ্চাতে ধাবিত হইলেন। ছাত্র ভয়ে দ্রুত বেগে পলায়ন করিল, এবং ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে দৌড়িতে দৌড়িতে অন্যান্য ছাত্রদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঘন ঘন নিঃশ্বাসের সহিত বলিতে লাগিল ভাই, নিমাই পণ্ডিত এখনি মারিয়া ফেলিয়াছিল! সকলে ইহাকে সাধু সাধু বলে, আমি তাই দেখিতে গিয়াছিলাম, গিয়া দেখি যে সে গোপী গোপী জপ করিতেছে। আমি কৃষ্ণের নাম জপ করিতে বলিলাম, ইহাতে একবারে ক্রোধে অগ্নি অবতার হইয়া সে লাঠি লইয়া আমাকে মারিতে আসিল, কৃষ্ণের নামে কত কটু কথা বলিল, ভাগ্যগুণে আজ আমি বাঁচিয়া আসিয়াছি। তাহার কথা শুনিয়া আর সকল ছাত্রগণ চৈতন্যকে গালি দিয়া নানা মতে নিন্দা করিতে লাগিল। কেহ বলে কেন, আমরাও ব্রাহ্মণ তিনিও ব্রাহ্মণ, তবে এত ভয় কিসের জন্য? তাঁহাকে বৈষ্ণবই বা কি রূপে বলিব? তিনি বৈষ্ণব হইয়া ব্রাহ্মণকে মারিতে

আসেন! আমরা এত সহিয়া থাকিব কেন? তিনিত আর রাজা নন? এস আমরাও সকলে ঠিক হইয়া থাকি, পুনরায় যদি তিনি মারিতে আসেন, আমরা আর সহ্য করিব না। তিনি জগন্নাথ মিশ্রের সন্তান, আমরাও কিছু সামান্য লোকের ছেলে নই? সে দিন আমরা তাঁহার সঙ্গে একত্র লেখা পড়া শিখিলাম, আজ তিনি গোসাঞী কি রূপে হইলেন? এইরূপে তাহারা চৈতন্যকে অপমান তিরস্কার করিল।

কয়েক দিন পরে নিমাই হঠাৎ পারিষদ ভক্তবৃন্দকে বলিয়া উঠিলেন, "আমি কফ নিবারণের জন্য পিপুল চূর্ণ করিলাম, কিন্তু তাহাতে দেখিতেছি কফ আরও বৃদ্ধি হইল!" এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিলেন। এ কথার অর্থ আর কেহ বুঝিতে পারিল না, কেবল নিতাই মনে মনে বুঝিলেন, এবার প্রভু গৃহত্যাগ করিবেন। এই ভাবিয়া তিনি দুঃখেতে অতিমাত্র বিষণ্ণ হইলেন। তদনন্তর চৈতন্য নিত্যানন্দের হস্তধারণপূর্ব্বক নিভৃতে বসিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ নিতাই, আমি যাহা করিব ভাবিলাম, তাহার বিপরীত হইল। কোথায় আমি জীব উদ্ধারের পথ পরিষ্কার করিব, না তাহাদিগকে সংহার করিলাম! আমাকে দেখিয়া লোকের বন্ধন বিমোচন হইবে, তাহা না হইয়া আরও সুদৃঢ় হইল! হায়! আমাকে মারিতে চাহিয়া তাহারা মহা পাপে পড়িয়া গেল। আর আমার গৃহাশ্রমে থাকা উচিত হয় না, শীঘ্রই আমি সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিব। তাহা হইলে গৃহী বলিয়া আর আমাকে তাহারা কেহ উপেক্ষা করিতে পারিবে না।" এই প্রাচীন হিন্দুস্থানে সর্ব্বত্যাগী উদাসীন না হইলে, সন্ন্যাসব্রতধারী হইয়া প্রকাশ্যরূপে বৈরাগীর বেশ না ধরিলে, তাঁহার ধর্ম্মভাবের প্রভাব সাধারণের নিকট তত সমাদৃত হয়না, আসক্তিশূন্য হইয়া গৃহেতে বৈরাগ্যধর্ম্ম পালন করিলে তাহার প্রকৃত মূল্য কেহ বুঝিতে পারে না, এই জন্য লোকশিক্ষার্থে গৌরকে প্রচলিত নিয়মানুসারে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে হইল। জীবের কল্যাণের জন্য ইহা আবশ্যক হইয়াছিল, তাহা না হইলে তাঁহার ভক্তির ধর্ম্মের মহিমা কেহ বুঝিতে পারিত না, এবং শিষ্যগণের সংসারবন্ধন শিথিল হইত না। যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া সঙ্কীর্ত্তনাদি করিতেন তাঁহারাও এ পর্য্যন্ত গূঢ় সংসারাসক্তির হস্ত হইতে প্রায় কেহই নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের প্রবল বৈরাগ্যাঘাত সকলের মর্ম্মস্থানকে কম্পিত করিয়াছিল। গৌর বলিলেন নিতাই, আমি নিশ্চয়ই এবার গার্হস্থ্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব, এজন্য তুমি দুঃখিত হইও না, আমাকে বিধান দাও, আমি চলিয়া যাই। নিতাই বলিলেন, তোমাকে আর কে বিধান দিবে? যাহা তোমার ইচ্ছা তাহাই তোমার কার্য্য; তথাপি আর পাঁচ জন ভক্তকে একবার জিজ্ঞাসা কর। নিমাইকে বিদায় দিয়া শচীদেবী কি রূপে প্রাণ ধারণ করিবেন ইহা ভাবিয়া নিত্যানন্দ অতিশয় শোকার্ত্ত হইলেন। নিতাইয়ের সঙ্গে কথা কহিয়া পরে চৈতন্য মুকুন্দ গদাধর প্রভৃতি কতিপয় বন্ধুকেও তদ্বিষয় জ্ঞাপন করেন। সোণার গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হইবেন, চিরকালের জন্য গৃহ পরিবার স্বদেশ বন্ধু বান্ধব ত্যাগ করিয়া যাইবেন, মস্তকের ঘন চিকুর কুন্তল ছেদন করিবেন, ইহা শুনিয়া সকলে নানামতে বিলাপ করিতে লাগিলেন। এই বজ্রতুল্য নিদারুণ বাক্য শ্রবণে ভক্তগণের মুখ ম্লান হইল। মুকুন্দ কাতর হইয়া প্রার্থনা করিলেন, প্রভো! যদি তুমি নিশ্চয়ই যাও, তবে আর দিন কয়েক আমাদের সঙ্গে থাকিয়া কীর্ত্তন কর। এ প্রস্তাবে গৌরের সম্মতি হইল। তদনন্তর তিনি সরল হৃদয় পরমাত্মীয় গদাধরকে সন্ন্যাসের অভিপ্রায় অবগত করাতে গদাধর দুঃখের সহিত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তোমার যত সব অদ্ভুত কথা! তবে কি তোমার মতে গৃহস্থ ব্যক্তি বৈষ্ণব হইতে পারে না? ইহাত তোমার বেদের মত নয়? দেখ ভাই নিমাই, প্রথমেইত তোমাকে মাতৃবধের ভাগী হইতে হইবে। তিনি কি আর তোমাকে বিদায় দিয়া প্রাণে বাঁচিবেন? যাও, যাহা ইচ্ছা কর, যদি মস্তক মুণ্ডন করিলে সুখী হও তবে তাহাই কর!

গদাধরের কথা যদিও যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু চৈতন্যের যেরূপ দায়িত্ব, পাপ সমাজের প্রতি তাঁহার যে প্রকার গুরুতর কর্ত্তব্য, দেশ কাল অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে গদাধরের কথা এখানে তত খাটে না। গৌর যদিও যুবক, কিন্তু তিনি কি করিতে আসিয়াছিলেন তাহা একবার ভাবিয়া দেখা চাই। জীবের দুঃখ দুর্গতি, ধর্ম্মসমাজের জীবনহীন শুষ্ক কঠোর ভাব দেখিয়া তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়াছিল, হস্তে প্রচুর অন্ন থাকিতে কি আর তিনি এই ঘোর দুর্ভিক্ষ দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? যাঁহার সংসার তাঁহারই আদেশে তিনি সন্ন্যাসী হইলেন, একটি পরিবার ত্যাগ করিয়া সহস্র সহস্র পরিবারকে ধর্ম্মনিয়মে নিয়মিত

করিলেন। যতই অনাসক্তচিত্ত বৈরাগী কেন তিনি হউন না, পরিবার মধ্যে থাকিলে অবোধ কুতার্কিক লোকে বলিবে, গৃহীর নিকট আবার বৈরাগ্য ভক্তি কি শিখিব? এ দেশে বৈরাগ্যসম্বন্ধে সাধারণের এমনি সংস্কার যে, ঈশ্বরাদেশে নিজের শরীর রক্ষা করিতে দেখিলে, কিংবা আত্মীয় পরিবারের প্রতি কিঞ্চিৎ মায়া মমতা প্রকাশ করিলে তাহারা বলে, এ ব্যক্তি স্বার্থপর; কেন না সে যথা নিয়মে পান আহার করে, এবং পরিবারকে ভালবাসে। সংসারে অনাসক্ত থাকিয়া ভক্তি বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা অতি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, কিন্তু সংসারের কুটিল চক্র সমুদায় ভেদ করিয়া তাহা দেখাইতে, এবং রিপুসংগ্রাম ও বৈষয়িক প্রতিকূলতার উপর জয়লাভ করিতে করিতে এ দিকে যে জীবনলীলা সাঙ্গ হইয়া আইসে! অতএব গৌর আপনার ধর্ম্মবুদ্ধিতে নিজের সম্বন্ধে যাহা শ্রেয়ঃ বোধ করিয়াছিলেন তাহার উপর আর তোমার আমার কোন কথা চলে না। গৌর আপনি সন্ন্যাসী হইয়াও অন্যকে গৃহী করিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্ম গৃহীর ধর্ম্ম।

গৌরগতপ্রাণ বৈষ্ণবগণ ও আত্মীয় বন্ধু প্রতিবাসী এই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া সকলেই মহা দুঃখিত হইল, অনেকে ভগ্নমনা হইয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিল। হায়! সন্ন্যাসী হইলে আর তবে আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইব না, আর তিনি নবদ্বীপের মৃত্তিকা স্পর্শ করিবেন না, গৌরধনে বঞ্চিত হইয়া আমরা কি লইয়া থাকিব, এমন সঙ্কীর্ত্তন আর কে শুনাইবে, এই বলিয়া তাহারা খেদ করিতে লাগিল। কোমলহৃদয় গৌরচন্দ্র বন্ধুগণকে শোক দুঃখে নিতান্ত কাতর দেখিয়া বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন, "ভাই সকল! আমি লোকশিক্ষার নিমিত্ত গৃহত্যাগ করিতেছি, কিন্তু তোমরা আমার চিরসঙ্গী জানিবে, চিরকাল আমি তোমাদের সঙ্গে থাকিব, আরও দুই বার এইরূপ সঙ্কীর্ত্তন এ দেশে হইবে, তোমরা চিন্তা দূর কর, আমার জন্য আর ভাবিও না।" অতঃপর তিনি সকলকে আলিঙ্গন দান করিয়া সুখী করিলেন।

পুত্রবৎসলা শচীমাতা প্রথমে যখন এই হৃদয়বিদারক সংবাদ শুনিলেন, দুর্জ্জয় শোকাবেগে তখন তাঁহার মূর্চ্ছা হইল। অনন্তর বহু বিলাপ ক্রন্দন করিয়া বলিলেন, রে বৎস নিমাই! তুমি অদ্বৈত শ্রীবাসাদির সঙ্গে গৃহে বসিয়া সঙ্কীর্ত্তন কর, দুঃখিনী জননীকে পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যাইও না; তুমি বনচারী হইলে আর আমার প্রাণ বাঁচিবে না। বিশ্বরূপ

একবার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, আমি পতিহীনা অনাথিনী, কেবল তোমার মুখ চাহিয়া জীবিত আছি, তুমিও যদি আমাকে পরিত্যাগ করিবে, তবে কাহাকে লইয়া আমি থাকিব? মাতাকে বধ করিয়া কিরূপে তুমি লোকদিগকে ধর্ম্ম শিখাইবে? হায়! হায়! বুক যে ফাটিয়া যায়; তবে আর কি আমি তোর চাঁদ মুখ দেখিতে পাইব না? হাতে ধরিয়া বলি বাপ! দুঃখিনীকে অকূল পাথারে ভাসাইয়া তুমি যাইও না। তুই যে আমার অঞ্চলের নিধি, প্রাণের অধিক, জীবনের সম্বল। শোকে অধীরা জননীর নয়ন-যুগলে অবিরল অশ্রুধারা দেখিয়া এবং তাঁহার মর্ম্ম-ভেদী কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া চৈতন্যের কণ্ঠ অবরোধ হইল, তিনি আর কিছু বলিতে পারিলেন না। শেষ শাস্ত্রবচন দ্বারা তাঁহাকে বৈরাগ্যপূর্ণ পরমার্থতত্ত্বের মর্ম্ম কিছু বুঝাইয়া দিলেন, তাহাতে মায়ের শোকাবেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইল।

এই ভাবে দুই চারি দিন যায়, ভক্তসঙ্গে চৈতন্য পূর্ব্ববৎ নাম সঙ্কীর্ত্তন করেন, তাঁহার সহবাসে থাকিয়া ক্রমে সকলে সন্ন্যাসের কথা ভুলিয়া যাইতে লাগিলেন। এ দিকে বিশ্বম্ভর গোপনে গোপনে নিতাইকে বলিয়া রাখিয়াছেন যে আমি আগামী উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিবসে গৃহত্যাগ করিয়া কাটোঁয়া নগরে কেশব ভারতীর নিকট দণ্ড গ্রহণ করিব। গদাধর, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর এবং ব্রহ্মানন্দও এ কথা জানিতেন; তাঁহারা পাঁচ জনে প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। যাইবার পূর্ব্ব দিন সমস্ত সময় ধর্ম্মালাপ, নাম সঙ্কীর্ত্তন এবং বন্ধুগণের সঙ্গে অনেক কথা বার্ত্তা হইয়াছিল। ঐ পাঁচ জন এবং শচী ভিন্ন কল্যকার কথা আর কেহ জানেন না। সন্ধ্যাকালে গৌরচন্দ্র বন্ধুবর্গের সহিত ভাগীরথীতীর পর্য্যটন করিয়া রজনীযোগে স্বীয় বাসভবনে সকলের সঙ্গে আলাপ করিতে বসিলেন। ভক্তগণ প্রতিদিন কেহ পুষ্পমালা, কেহ সুগন্ধি চন্দন আনিয়া গৌরদেহকে সজ্জিত করিতেন। কেহ বা উপাদেয় ফল শস্য আনিয়া উপহার দিতেন। অনন্তর ভক্তমণ্ডলীমধ্যে হরিগুণ গান, সৎপ্রসঙ্গ, প্রেম ভক্তির বিনিময় হইতে লাগিল; রজনী প্রভাত হইলে নবদ্বীপচন্দ্র সমস্ত অন্ধকার করিয়া সন্ন্যাসে চলিয়া যাইবেন, শচী এবং ঐ পাঁচ জন ব্যতীত আর কেহ তাহা অবগত নহেন। নবদ্বীপ-ধামে গৌরচন্দ্রের এই শেষ দরবার। তিনি ভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভাই সকল! তোমরা হরিনাম বিনা আর কিছু জানিবে না,

সদা সর্ব্বদা নামগুণগানে রত থাকিবে, হরিনামের জয়ধ্বনি করিবে, শয়ন ভোজন জাগরণে নিরন্তর তাঁহার নাম বদনে বলিবে; যদি আমার প্রতি তোমাদের স্নেহ ভালবাসা থাকে, তবে আমার এই উপদেশ তোমরা পালন করিও।” পরে প্রসন্নমুখে শুভদৃষ্টিতে একে একে সকলকে বিদায় দিলেন। এমন সময় শ্রীধর এক লাউ হস্তে করিয়া আসিয়া উপস্থিত। শ্রীধর ঠাকুর গৌরাঙ্গের বড় প্রিয়পাত্র, সুতরাং তাঁহার লাউ থোড় ইত্যাদি সমস্তই তাঁহার বড় মিষ্ট লাগিত। সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে বসিয়াছেন, তথাপি দীন সেবক পরম ভাগবত শ্রীধরের লাউ উপেক্ষা করা হইবে না; জননীকে সেই রাত্রিতেই লাউ রন্ধন করিতে অনুমতি দিলেন।

সকলে বিদায় হইলে আহারান্তে বিশ্বম্ভর শয়ন করিলেন, হরিদাস, গদাধর বহির্দ্বারে প্রহরী রহিলেন। অপর জীবসকল নিদ্রায় নিমগ্ন, চারিদিক্ নিস্তব্ধ, কিন্তু সে কাল নিশিতে শচীর চক্ষে আর নিদ্রা নাই, নয়নজলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে, কেবল তত্ত্বোপদেশের গুণে এবং পুত্রের অলৌকিক প্রভাবে অপেক্ষাকৃত তিনি শান্ত হইয়া আছেন। পতিপ্রাণা অবলা বিষ্ণুপ্রিয়া পর দিবসে কি ঘোর পরীক্ষায় নিপতিত হইবেন তাহার কিছুই জানেন না, চৈতন্য তাঁহাকে কোন কথাই বলেন নাই, বরং সে রাত্রে তিনি বিশেষরূপে তাঁহাকে প্রেম প্রদর্শন করিলেন। নিশাপ্রভাতে যে দুঃসহ শোকের ব্যাপার প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে তাহার সঙ্গে পূর্ব্ব রজনীর কি বিপরীত সম্বন্ধ! এক দিকে স্নেহপূর্ণ পারিবারিক প্রেমবন্ধন, অপর দিকে ডোর কৌপীন শিখাসূত্রপরিত্যাগ চিরবৈরাগ্য; নিশান্তে সন্ন্যাসের নির্দ্দয় অস্ত্রাঘাতে সমস্ত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে, অথচ তাহার পূর্ব্বে কতই মায়া মমতা প্রীতি স্নেহ! কি অলৌকিক অনাসক্তি! নিদ্রাভিভূতা সুবর্ণপ্রতিমা বিষ্ণুপ্রিয়াকে অনন্ত শোকসিন্ধুতে নিমগ্ন করিয়া প্রভু সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করেন।

রাত্রিশেষে চৈতন্য বহির্গমনের আয়োজন করিতেছেন দেখিয়া হরিদাস এবং গদাধর তাঁহার সঙ্গে যাইতে চাহিলেন। মহাপ্রভুর মনে তখন আর একটি নূতন ভাব আবির্ভূত হইয়াছে। দুই আশ্রমের সন্ধিস্থলে পতিত হইয়া তিনি দাবানলদগ্ধ অরণ্যের ন্যায় ভীষণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে বলিলেন, আমার সঙ্গী আর কেহ নাই, কেবল

সেই এক অদ্বিতীয় আমার সঙ্গী। পুত্রের গমনশব্দ শ্রবণে শচী দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিলেন। গৌর তখন পাগলের প্রায়। জননীর দুইটি হাত ধরিয়া অতি বিনয় ও ব্যাকুলতার সহিত বলিতে লাগিলেন, "মাতঃ! তোমার অপরিশোধ্য ঋণে আমি বদ্ধ আছি। তুমি আমার জন্য কত কষ্ট সহ্য করিলে, নিজের সুখের প্রতি একবারও দৃষ্টি কর নাই, আমার লালন পালন শিক্ষা পাঠ, সুখ স্বাস্থ্য বৃদ্ধির জন্যই চির দিন যত্ন করিয়াছ, এ ঋণ আমি কোন কালে শোধ দিতে পারিব না। শুন জননি, ঈশ্বরের অধীন সমস্ত সংসার, তিনি সংযোগ করেন, আবার তিনিই বিয়োগ করিয়া দেন. তাঁহার ইচ্ছা বুঝিবার শক্তি কাহার আছে? তোমার পরমার্থ সম্বন্ধীয় সমস্ত ভার আমার উপর রহিল।" পুনর্ব্বার মাতৃবক্ষে হস্ত রাখিয়া বলিলেন, তোমার সকল ভার আমার উপরে রহিল। যত কিছু তিনি বলিলেন, শচী তাহা নিরুত্তর হইয়া শুনিয়া অবিশ্রান্ত নয়নজলে ধরাতল সিক্ত করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই গুণধাম পুত্র গৌরচন্দ্র মাতার পদধূলি মস্তকে ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া বহির্গত হইলেন। কিছু দূর একাকী গিয়াছিলেন, তাহার পর উপরিউক্ত পাঁচ জন ভক্ত পথে গিয়া তাঁহার সঙ্গে সম্মিলিত হন।

প্রাণাধিক অঞ্চলের নিধি পুত্রকে বিদায় দিয়া রোরুদ্যমানা শচীমাতা ধরাসনে পড়িয়া রহিলেন। চিরদুঃখিনী বিষ্ণুপ্রিয়া বাণবিদ্ধ কুরঙ্গিণীর ন্যায় অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আনন্দময় গৌরের গৃহ একবারে যেন ঘোর শ্মশানের ন্যায় হইয়া উঠিল। মাতা ও বধূর আর্ত্তনাদে আকাশ ফাটিতে লাগিল। উষাকালে স্নান করিয়া মহন্তগণ গুরুদেবকে প্রণাম করিতে আসিয়া দেখেন গৃহ শূন্য, শোকের মলিন বসনে সমুদায় আচ্ছন্ন, নবদ্বীপ অন্ধকার করিয়া গৌর কোথায় চলিয়া গিয়াছেন! পতিবিরহিণী বিষ্ণুপ্রিয়া এবং শোকাতুরা শচীর অজস্র অশ্রুধারা তাঁহাদিগকেও গৌরশোকে ব্যাকুল করিয়া দুঃখসাগরে ডুবাইল। মহন্ত বৈষ্ণবগণ শিরে করাঘাত করিয়া তথায় বসিয়া পড়িলেন, চতুর্দ্দিকে হাহাকার ধ্বনি উঠিল! যে এ কথা শ্রবণ করে সেই দুঃখেতে ব্যাকুল হয়। শচী বলিলেন বৎসগণ! তোমরা এই সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী লইয়া যাও, আমি যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে চলিয়া যাই। কাহার মুখ চাহিয়া আমি গৃহে বাস করিব? নগরবাসী নরনারী এই বিষম শোকাবহ সংবাদ শ্রবণে

শচীগৃহে উপস্থিত হইয়া হা হতোঽস্মি! করিতে লাগিল। কঠোরহৃদয় চির-বিরোধী ব্যক্তিরাও রোদন করিতে লাগিল। সমস্ত নগর যেন গৌরবিরহে আকুল হইয়া শোকবসন পরিধান করিল। নয়নের জলে নবদ্বীপ ভাসিতে লাগিল। প্রতিবাসীরা তখন বলে হায়! সে চন্দ্রানন আর কি দেখিতে পাইব না! কেহ বলে ঘরে আগুন দিয়া চল আমরা বাহির হই, এবং কর্ণে কুণ্ডল পরিয়া যোগীর বেশ ধারণ করি। চৈতন্য যদি দেশ ছাড়িলেন তবে আর আমাদের বাঁচিয়া কি সুখ? শত্রু মিত্র জ্ঞানী কর্ম্মী তার্কিক সকলেই শোকার্ত্ত হইল। গৌর যেন বৈরাগ্যের বিশাল লৌহ দণ্ড দ্বারা সকলকে চূর্ণ করিয়া চলিয়া গেলেন। অতি বড় বিষয়াসক্ত ঘোর সংসারীর মনও এ কথা শুনিয়া উদাস হইয়াছিল। অদ্বৈত শ্রীবাসাদি ভক্তমণ্ডলী পূর্ব্বরজ-নীতে প্রভুর সঙ্গে কীর্ত্তন করিয়াছেন, প্রাতে আর তাঁহাকে কোথাও দেখিতে পান না, পাগলের ন্যায় দিশাহারা হইয়া কত ক্ষণ ইতস্ততঃ দৌড়া দৌড়ি করিয়া যখন প্রকৃত ঘটনা শুনিলেন, তখন যিনি যে ভাবে ছিলেন তিনি সেই ভাবেই রহিয়া গেলেন, আর কাঁদিবার শক্তিও থাকিল না। হরিদাস অদ্বৈত প্রভৃতি সকলেই অকূল শোকসাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

এ দিকে গঙ্গা পার হইয়া ঊষাকালের তরুণ সূর্য্যের ন্যায় মত্ত সিংহ গৌররায় কাটোঁয়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। পূর্ব্ব কথানুসারে গদাধর, নিতাই, চন্দ্রশেখর, মুকুন্দ, ব্রহ্মানন্দ পাঁচ জনে পথিমধ্যে তাঁহার সঙ্গে মিলিত হন। কাটোঁয়া পৌঁছিতে সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল। কেশব ভারতীর কুটীরে উপস্থিত হইয়া গৌর তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলিলেন, আর্য্য! অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে উপদেশ প্রদান করুন! এই কথা বলিতে বলিতে প্রেমজলে তাঁহার সর্ব্ব শরীর অভিষিঞ্চিত হইল। শেষ মহা হুঙ্কার ধ্বনি করিয়া নাচিতে লাগিলেন, দেহে ভক্তির অষ্ট সাত্বিক বিকার প্রকাশ পাইতে লাগিল, মুকুন্দ মধুর স্বরে গান আরম্ভ করিলেন, নিমেষের মধ্যে তথায় ভাবের তরঙ্গ উঠিল। ভক্ত গৌরের তেঃজপুঞ্জ দেহ, অদ্ভুত মুখজ্যোতি, প্রেমের মত্ততা, ভাবের উচ্ছ্বাস, মত্ত মাতঙ্গবৎ নৃত্য কুর্দ্দন নিরীক্ষণ করিয়া ভারতী গোসাঞী চিত্রপুত্তলি-কারে ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, দর্শকবৃন্দ মোহিত হইয়া গেল। গৌরচন্দ্র দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া সকলের নিকট দাস্যমুক্তি ভিক্ষা চাহিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রন্দন হাস্য হুঙ্কার নৃত্য দেখিয়া তত্রত্য নরনারীগণ

কাঁদিতে লাগিল। ভারতী বলিলেন, শুন বিশ্বম্ভর! তোমার সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণের প্রস্তাব শুনিয়া আমার অন্তর কম্পিত হইতেছে। তুমি এমন সুন্দর যুবা পুরুষ, জন্মাবধি দুঃখের লেশমাত্র জান না, এখনও অপত্য সন্ততি তোমার হয় নাই, পঞ্চাশ উর্দ্ধ হইলে তবে সংসারকামনা নিবৃত্ত হয়, অতএব তোমাকে সন্ন্যাসী করা বিচারসিদ্ধ হইতেছে না। তবে যদি একান্তই সন্ন্যাসী হইতে ইচ্ছা কর, গৃহে গিয়া জননী এবং আর সকলের নিকট বিদায় লইয়া আইস, তদ্ভিন্ন কেমন করিয়া আমি এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারি। এ কথা শ্রবণে গৌর নিতান্ত কাতর হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, তোমার নিকট আমি আর কি বলিব, ধর্ম্মের তত্ত্ব আমি কি জানি; সংসারে আসিয়া এই দুর্ল্লভ মানব জন্ম পাইয়াছি, ক্ষণভঙ্গুর এই দেহ, বিলম্ব করিতে গেলে যদি দেহ ধ্বংস হইয়া যায় তবে আর আমি বৈষ্ণবের সঙ্গ কবে করিব! তুমি আমাকে নিরাশ করিও না, তোমার প্রসাদে আমি কৃষ্ণের দাস হইয়া থাকিব। এই বলিয়া অত্যন্ত ব্যাকুলতার সহিত তিনি ভারতীর চরণালিঙ্গন করিলেন। তখন ভারতী গোস্বামীকে পরাস্ত হইতে হইল। তাদৃশ ব্যাকুলতা দেখিয়া কি আর কেহ স্থির থাকিতে পারে? বিশ্বম্ভর ইতঃপূর্ব্বে স্বপ্নযোগে এক মন্ত্র পাইয়াছিলেন তাহা ভারতীকে জানাইলেন এবং সেই মন্ত্রে পুনর্ব্বার আপনি দীক্ষিত হইলেন। দণ্ডী ভারতী যখন তাঁহাকে সন্ন্যাসী করিতে সম্মত হইলেন, তখন গৌরের আহ্লাদের আর সীমা রহিল না, উন্মত্তপ্রায় হইয়া তিনি নৃত্য করিতে লাগিলেন। কাটোঁয়াবাসী স্ত্রী পুরুষ বালক বৃদ্ধ যুবা এই অলৌকিক ধর্ম্মোন্মত্ততা দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। শত শত লোক একত্রিত হইয়া আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে লাগিল। নারীগণ দুঃখিত হইয়া বলে, আহা! এমন সুন্দর রূপ আরত কখন দেখি নাই! নয়ন যে আর ফিরাইতে পারি না। হায়! এমন যুবাকালে সন্ন্যাসী হইলে ইহার মাতা কিরূপে জীবন ধারণ করিবে! স্ত্রী ইহা শুনিলে যে তৎক্ষণাৎ প্রাণে মরিবে! লোকদিগকে এই প্রকারে শোক বিলাপ করিতে দেখিয়া গৌর তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ও গো মা বাপ সকল! তোমরা আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, হরিপদে মস্তক সমর্পণ করিব এই আমার বড় সাধ। তিনি আমার প্রাণপতি, তাঁহাকে ছাড়িয়া আমার আর অন্য গতি নাই। এই কথা বলিয়া তিনি অনবরত রোদন করিতে লাগিলেন।

পর দিন প্রাতে চন্দ্রশেখর দীক্ষা গ্রহণের যাবতীয় আয়োজন প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন। নিকটস্থ অধিবাসিগণ সকলে দলে দলে দেখিতে আসিল। গঙ্গাতীরস্থ ভারতীর আশ্রম হরিধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল। কেশব ভারতী শিষ্যের অনুপম দেবভাব দর্শনে আপনাকে আপনি ধন্য মনে করিতে লাগিলেন। যথাকালে গৌরসুন্দর মস্তক মুণ্ডন করিবার জন্য নাপিতের নিকট বসিলেন। তখন চারিদিক্ হরিধ্বনি ও ক্রন্দনকোলাহলে শব্দায়মান হইয়া উঠিল। এক দিকে সঙ্গী ভক্তগণ বসনাবৃত বদনে অবিশ্রান্ত রোদন করিতেছেন, অন্য দিকে দর্শক নরনারীগণ চীৎকার স্বরে কাঁদিয়া বলিতেছে, হায়! হায়! ইহার জননী এবং ভার্য্যা কেমন করিয়া প্রাণ ধারণ করিবে। একে পরম সুন্দর গৌর রূপ, তাহাতে যুবা বয়স, মনোহর চিকুর কেশ, নাপিত আর কিছুতেই ক্ষুর ধরিতে পারে না। সে ক্ষৌরি করিবে কি নিজেই কাঁদিয়া অস্থির হইল। চৈতন্য এক দণ্ডের জন্যও স্থির নহেন। সহজেই ভক্তির প্রবল আবেশে উন্মাদ, তাহাতে ব্রহ্মচর্য্যব্রতের অগ্নিময় সাগরগর্ভে প্রবেশ করিতেছেন, কিছুতেই আর স্থির হইতে পারেন না। বিস্ফারিত ভাবরসে শরীর কদম্বাকৃতি হইতেছে, অনুরাগের ভীষণ বায়ু-হিল্লোলে হৃদয়সিন্ধুমধ্যে নব নব ভাবের তরঙ্গ উঠিতেছে, তদুপরি প্রেমের সুমন্দ লহরীলীলা সমুত্থিত হইয়া মত্ত হস্তীর ন্যায় চিত্তকে উন্মাদ করিয়া তুলিতেছে, এক একবার হরি! হরি! বলিয়া ভীম গর্জ্জনে হুঙ্কার করিতেছেন, নাপিতের সাধ্য কি যে শিখা মুণ্ডন করে। মস্তকে হস্তস্পর্শ করিতে গিয়া নাপিত কাঁপিতে লাগিল। সে বলিল ঠাকুর! তোমার শিরোমুণ্ডন করা আমার কর্ম্ম নয়, কেহ যদি পারে করুক, আমি পারিব না, আমার ভয়েতে সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছে। অধম নাপিত জাতি আমি, তোমার মাথায় হাত দিয়া সেই হাত আমি আবার কার পায়ে দিব? আমার দ্বারা ইহা হইবে না। তখন মহাপ্রভু প্রসন্ন হইয়া তাহাকে প্রবোধবচনে বলিলেন, তুমি আর এ ব্যবসায় করিওনা, কৃষ্ণের কৃপায় তুমি ইহলোকে সুখী হইবে এবং পরলোকে স্বর্গ লাভ করিবে। তৎপরে বহু কষ্টে সমস্ত দিনে ক্ষৌরিকার্য্য সমাধা হইল। গৌরাঙ্গ নিজপ্রদত্ত মন্ত্র গুরুমুখ হইতে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিয়া চতুর্গুণ উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। কি নাম রাখিবেন ইহা ভাবিয়া ভারতী গোস্বামী আর সকলের নিকট বুদ্ধির পরামর্শ লইতেছিলেন, এমন সময় "শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য" এই দৈববাণী হইল। চৈতন্য

যখন মস্তক মুণ্ডন করিয়া অরুণ বসন পরিধানান্তর এক হস্তে দণ্ড অপর হস্তে কমণ্ডলু ধারণ করিলেন তখন বোধ হইতে লাগিল যেন তিনি মহাবৈরাগ্যের জ্বলন্ত হুতাশনে অবগাহন করিয়া উঠিলেন। তপ্তকাঞ্চনতুল্য গৌরদেহে রক্তবসন কি অপূর্ব্ব দেবপ্রভাই বিস্তার করিল! তখন অস্তাচলচূড়াবলম্বী লোহিত বর্ণ তপনের ন্যায় তাঁহার শোভা হইল। বৈরাগ্যের প্রদীপ্ত কিরণে মুখমণ্ডল যেন ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। যে দিকে তিনি নয়ন ফিরান সে দিক্ যেন একবারে দগ্ধ করিয়া ফেলেন। নবীন ব্রহ্মচারী ভক্তাবতার বিশ্বম্ভরের এই সন্ন্যাসবিবরণ শুনিলে সুদৃঢ় সংসারবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। দীক্ষার পর হইতে ইহাঁর নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য হইল। ১৪৩১ শকে [১৫০৯ খৃষ্টাব্দে] পঁচিশ বৎসর বয়সে উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিবসে চৈতন্য সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করেন। গৌরসন্ন্যাসের এই অনির্ব্বচনীয় ভাবদর্শনে মোহিত হইয়া প্রেমদাস নিম্ন লিখিত সঙ্গীতটি রচনা করিয়া গাইয়াছিলেন।

(কীর্ত্তন) "কি দেখিলাম রে, কেশব ভারতীর কুটীরে, অপরূপ জ্যোতি, গৌরাঙ্গমূরতি, দুনয়নে প্রেম বহে শত ধারে।

গৌর মত্ত মাতঙ্গের প্রায়, প্রেমাবেশে নাচে গায়, কভু লুটায়ে ধরায় নয়নজলে ভাসে রে; কাঁদে আর বলে হরি, স্বর্গ মর্ত্ত্য ভেদ করি, সিংহ রবে রে; আবার দন্তে তৃণ লয়ে, কৃতাঞ্জলি হয়ে, দাস্যমুক্তি যাচেন দ্বারে দ্বারে।

কি বা মুড়ায়ে চাঁচর কেশ, ধরেছেন যোগীর বেশ, দেখে ভক্তিভাবাবেশ, প্রাণ কেঁদে উঠে রে; জীবের দুঃখে কাতর হয়ে, এলেন সর্ব্বস্ব ত্যজিয়ে প্রেম বিলাতে রে; প্রেমদাসের বাঞ্ছা মনে, চৈতন্যচরণে দাস হয়ে সঙ্গে বেড়াই ঘুরে।"

ভারতী গোস্বামী চৈতন্যকে সন্ন্যাসী করিয়া সে দিন সমস্ত রাত্রি আনন্দ মনে উভয়ে হরিসঙ্কীর্ত্তন করিলেন। লোকগুরু প্রেমিক ভক্তকে তিনি শিষ্যত্বে বরণ করিয়া আপনিও কৃতার্থম্মন্য হইলেন, ভক্তি প্রেমের আস্বাদন পাইলেন। তদনন্তর গুরুস্থানে বিদায় লইয়া সেই বৃহদ্‌ব্রতধারী ভক্তিরসসিন্ধু চৈতন্য গোসাঞী বনপ্রস্থানের ইচ্ছা প্রকাশ করাতে, ভারতী বলিলেন আমিও তোমার সঙ্গে যাইব, সর্ব্বদা আমি তোমার সঙ্গে হরিসঙ্কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইব। গমনকালে চৈতন্যদেব চন্দ্রশেখরকে কোলে লইয়া পদ্মপলাশলোচনে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, তুমি গৃহে

প্রত্যাগমন কর এবং সকল বৈষ্ণবকে সংবাদ দাও যে আমি বনপ্রস্থান করিলাম। কিছু চিন্তা করিও না, তুমি আমার পিতা, আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা তুমি আছ, কোন কালে আমার সঙ্গে তোমার বিচ্ছেদ হইবে না।

চন্দ্রশেখর ভগ্নান্তঃকরণে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শচীদেবীর প্রথমে আর বাক্য নিঃসরণ হইল না। তদনন্তর উথলিত শোকাবেগে ব্যাকুল হইয়া আলুলায়িত কেশে উন্মাদিনীর ন্যায় দৌড়িয়া গিয়া চন্দ্রশেখরের নিকট তিনি পুত্রবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করত বহু আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। পুনরায় ক্রন্দনের উপর গভীর ক্রন্দনের ধ্বনি নবদ্বীপকে আচ্ছন্ন করিল। চন্দ্রশেখর কথা কহিবেন কি, শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার অবস্থা দর্শনে তাঁহার এক গুণ শোক দশ গুণ বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। রোদনশব্দ শুনিয়া গৌরভক্ত শোকদগ্ধ বৈষ্ণব ও প্রতিবাসিগণ তথায় উপস্থিত হইলেন। গৃহমধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়া জীবন্মৃতের ন্যায় ভূমিতে পড়িয়া বক্ষে করাঘাত হানিতেছেন। শচী কাঁদিয়া বলিলেন ও রে চন্দ্রশেখর! তুই আমার প্রাণের বিশ্বম্ভরকে কোথায় রাখিয়া আসিলি বল্! কোন্ গ্রামে কোন্ দেশে কোন্ সন্ন্যাসীর আশ্রমে কিরূপে নিমাই মাথা মুড়াইল, কোন্ নিষ্ঠুর নাপিত তাহার সুন্দর কেশ ছেদন করিল, কোথায় গিয়া আমার সেই প্রাণাধিক গৌরচন্দ্র ভিক্ষা করিল, কি ভাবে সে এখন কোথায় আছে সমস্ত আমাকে বল্! হায়! সে চাঁদমুখ আর আমি চুম্বন করিতে পাইব না! আমার সকল দিক্ যে অন্ধকার হইল! তেমন করিয়া আর কাহার পাতে আমি ভাত রাঁধিয়া দিব! তাহার কোমল অঙ্গে কে আর হাত বুলাইবে! সে যে পাগল আত্মবিস্মৃত, ক্ষুধার সময় কে তাহাকে খাওয়াইবে! মা বলিয়া কে আর আমার সন্তপ্ত প্রাণকে শীতল করিবে। হায়! হায়! আমার হৃদয়ের ধন নিমাই, তুমি কোথায় রহিলে! বাপ! এক দিন তোরে না দেখিলে আমি সমস্ত শূন্য দেখিতাম, এখন তোর অদর্শনে কিরূপে জীবন ধারণ করিব! হা! এ নির্দ্দয় প্রাণ আর কত ক্ষণ দেহে থাকিবে! আমার যে সকল আশা ফুরাইয়া গেল! পৃথিবী অরণ্যময় হইল! আমি এখন কোথায় গিয়া কাহার নিকট দাঁড়াইব! বিষম শোকে অভিভূত হইয়া শচীমাতা শিরে আঘাত করিলেন, সর্ব্বাঙ্গে রুধির ধারা বহিতে লাগিল। অপর দিকে বিষ্ণুপ্রিয়া দুর্ব্বিষহ পতি বিরহ যন্ত্রণার অনলে দগ্ধ বিদগ্ধ হইয়া হাহাকার করিতেছেন। যাহারা তাঁহাকে প্রবোধ

দিতে যায় তাহারা আপনারাই কাঁদিয়া আকুল হইয়া ফিরিয়া আসে। চন্দ্রশেখরকে দেখিয়া এইরূপে সকলের শোকানল প্রদীপ্ত হইয়াছিল। প্রভুর সন্ন্যাসবার্ত্তা এবং বনগমন সংবাদ শ্রবণে অদ্বৈত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, আর আর ভক্তগণ ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য হারাইয়া কেহ বলেন এ প্রাণ আর রাখিব না, কেহ বলেন বিরাগী হইয়া এক দিকে চলিয়া যাইব। সেই আনন্দের মেলা ভাঙ্গিয়া ভক্তসমাজ এখন যেন বিষম শোকের আলয় হইল। এমন সময় তাঁহারা এই দৈববাণী শুনিলেন,—"পুনরায় তোমরা শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে মিলিত হইয়া পূর্ব্ববৎ নামসঙ্কীর্ত্তন এবং প্রেমবিহার করিবে। কয়েক দিন পরে তাঁহার দেখা পাইবে, নিরাশ হইও না।" দৈববাণী শ্রবণে সকলে ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন, এবং শচীকে বেষ্টন করিয়া সেই শুভ দিনের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

চন্দ্রশেখরকে গৃহে পাঠাইয়া চৈতন্য অবশিষ্ট কয়েক জন বন্ধু এবং কেশব ভারতীকে সঙ্গে লইয়া পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করেন। এক্ষণে ভক্তি-চন্দ্রিকার সহিত বৈরাগ্যের মধ্যাহ্ণ সূর্য্য মিলিত হইল। প্রেম পুণ্যের ঘনীভূত জ্যোতিতে চৈতন্যের হৃদয়াকাশ জ্যোতিষ্মান হইল। তখন তিনি চারি দিক্ হরিময় দেখিতে লাগিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর কয়েক দিন ভাগবতোক্ত এই শ্লোকটি তিনি বারংবার আবৃত্তি করিয়াছিলেন;—"এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহদ্ভিঃ। অহন্তরিষ্যামি, দুরন্তপারং তমো-মুকুন্দাংঘ্রিনিষেবয়ৈব।" অর্থাৎ পূর্ব্বতন সাধুদিগের অবলম্বিত পরমাত্মনিষ্ঠা আশ্রয় করিয়া মুকুন্দচরণসেবা দ্বারা আমি এই দুস্তর মোহান্ধকার উত্তীর্ণ হইব। ভক্ত যোগী শ্রীচৈতন্য যে গ্রামের ভিতর দিয়া যান বোধ হয় যেন একটী উজ্জ্বল অগ্নিশিখা চলিয়া গেল। পথে পথে গ্রামে গ্রামে লোকের সমারোহ হইল। তাঁহার গমন আরত সহজ নয়, একজন মহাপুরুষ যাই-তেছেন তাহা সকলে বুঝিতে পারিল। মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় এমনি দ্রুত-বেগে তিনি চলিতে লাগিলেন যে সঙ্গিগণ হাঁটিয়া উঠিতে পারেন না। তদ্দেশীয় প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শনে পুলকিত হইয়া আনন্দের তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে ক্রমাগত চলিলেন। বীরভূম অঞ্চলে বক্রেশ্বরের বনমধ্যে কিছু দিন নির্জ্জনবাস করিবেন এই তাঁহার অভিপ্রায়। সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে কোন পল্লীমধ্যে এক ব্রাহ্মণগৃহে অতিথি হইয়া আহারান্তে তথায় সকলে নিদ্রিত আছেন, প্রহরেক রাত্রি থাকিতে তাঁহারা দেখেন যে,

চৈতন্য কোথায় উঠিয়া গিয়াছেন। নিত্যানন্দ প্রভৃতি সঙ্গিগণ মহা ভাবিত হইলেন, গৃহস্থের মনও বড় চিন্তিত হইল, নানা স্থান অন্বেষণ করিয়া তাঁহারা শেষ দেখিলেন, প্রান্তরমধ্যে একাকী বসিয়া গোসাঞী কৃষ্ণ রে বাপ! কোথা গেলে! এই বলিয়া এমনি চীৎকার রবে কাঁদিতেছেন, যে তাহা এক ক্রোশ দূর হইতে শুনা যাইতেছে। কি ব্যাকুলতাই তাঁহার ছিল! আর কত রোদনই বা তিনি করিতেন! চক্ষে যেন গঙ্গানদী বহিয়া যাইত। তাহার এক বিন্দু জল পাইলে আমাদের পাপদগ্ধ জীবন শীতল হয়। ইচ্ছা হয়, মনের অনুরাগে একাকী প্রান্তরে বসিয়া তেমনি করিয়া কাঁদি। চৈতন্যের প্রেমের ক্রন্দন শুনিলে পাষাণ হৃদয় দ্রবীভূত হইত। ক্রন্দনের শব্দানুসারে সঙ্গিগণ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া সেইখানে সকলে মিলে কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন, বিরহের উত্তাপ কতক বাহির হইয়া গেল, তার পর প্রভু গম্যস্থানে যাত্রা করিলেন। বক্রেশ্বর পৌঁছিতে চারি ক্রোশ পথ বাকী আছে এমন সময় যাত্রীকের গতি পুনরায় পূর্ব্বাভিমুখে ফিরিল। গৌর বলিলেন আমি নীলাচল যাত্রা করিব, জগন্নাথ প্রভু আমাকে যাইতে আজ্ঞা করিয়াছেন। পথে আসিবার কালে কোথাও আর হরিনাম শুনিতে পান না, তজ্জন্য দুঃখিত হইয়া আসিতেছেন, সহসা এক রাখাল বালক হরিনাম গান করিয়া উঠিল, তাহা শুনিয়া গৌরাঙ্গ মহা সন্তুষ্ট হইলেন। তদনন্তর গঙ্গাস্নানের ইচ্ছা হইল। এমনি প্রবলবেগে গঙ্গার অভিমুখে তিনি আসিতে লাগিলেন যে নিত্যানন্দ ব্যতীত আর কেহ সঙ্গে যোগ দিয়া উঠিতে পারিলেন না। ভাগীরথীর নির্ম্মল সলিলে অবগাহনান্তর সুস্থতা লাভ করিয়া তথায় নিকটবর্ত্তী কোন এক গ্রামে রজনী যাপন করেন। তৎপর দিবসে অপর সঙ্গিগণ পৌঁছিলেন, তখন দলবদ্ধ হইয়া সকলে নীলাচল যাত্রা করিলেন। কিয়দ্দূর আসিয়া চৈতন্য নিতাইকে বলিলেন তুমি নবদ্বীপ যাও, গিয়া বৈষ্ণবদিগকে বল আমি নীলাচলে চলিলাম, ফুলিয়া গ্রামে হরিদাসকে দেখিয়া শান্তিপুর নগরে অদ্বৈত আচার্য্যের ভবনে আমি অপেক্ষা করিব, তুমি বন্ধুবর্গকে সঙ্গে লইয়া শীঘ্র তথায় আসিবে। অতঃপর নিত্যানন্দকে বিদায় দিয়া মহাপ্রভু হরিদাসের আশ্রমে চলিলেন।

শান্তিপুরে ভক্তের মেলা।

শান্তিপুরে চৈতন্য আসিয়াছেন শুনিয়া সহস্র সহস্র লোক তথায় ধাবিত হইল। প্রভূত উৎসাহের সহিত হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে দলে দলে সকলে গঙ্গা পার হইতে লাগিল। এত লোকের ভিড় হইল যে নৌকায় আর ধরে না। দুই এক খান নৌকা ডুবিয়াও গেল, কিন্তু কাহারো প্রাণের হানি হয় নাই। চতুর্দ্দিক্ হইতে উর্দ্ধশ্বাসে লোক সকল ফুলিয়ার দিকে দৌড়িতে লাগিল। একটি প্রকাণ্ড উৎসবের মত হইয়া দাঁড়াইল। গৌরবিরহশোকের জ্বলন্ত আগুণের উপর তাঁহার পুনর্দ্দর্শন লালসা উদিত হইয়া লোকের প্রাণকে যেন অস্থির করিয়াছিল। আশা উৎসাহে পুলকিত হইয়া সকলে নামসঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে বাহির হইলেন, কেহ কেহ শচী-দেবীর শিবিকার সঙ্গে চলিলেন। এই সময় চিরদুঃখিনী বিষ্ণুপ্রিয়া যে কথাটী বলিয়াছিলেন তাহা শুনিলে হৃদয় নিতান্ত ব্যাকুল হয়। হরিধ্বনি সহকারে দলে দলে নরনারী সকলে চলিল, শচীদেবীও চলিলেন, যাত্রিগণের আনন্দ-কোলাহলে গগনমেদিনী কম্পিত হইল, ইহা দেখিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া আর কিছু-তেই ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না। এই বলিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন, হায়! সকলেই আমার প্রাণনাথকে দেখিতে চলিল, আমি অভাগিনী এত কি অপরাধ করিয়াছিলাম যে তাঁহাকে একবার চক্ষে দেখি-তেও পাইব না! হায়! বিধাতা যদি আমাকে প্রভুপত্নী না করিতেন, তাহা হইলে আমিও তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম। এই বলিয়া তিনি অজস্রধারে নয়নাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিলাপ আর্ত্তনাদ শুনিয়া ভক্তগণের হৃদয় অতিমাত্র ব্যথিত হইয়াছিল। শচীমাতা অনেক বুঝাইয়া, দুই এক জন আত্মীয়ের নিকট তাঁহাকে রাখিয়া চলিয়া গেলেন। সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিলে পত্নীর মুখাবলোকন করিতে নাই, এই জন্য বিষ্ণুপ্রিয়াকে পতিদর্শনে বঞ্চিত হইতে হইল। গয়া হইতে প্রত্যাগমনের পর শচীনন্দন আর গৃহীর ন্যায় সংসারধর্ম্ম করেন নাই, গৃহবাসী বৈরাগী হইয়া সর্ব্বদা ভক্তিরসেই প্রমত্ত থাকিতেন, তথাপি তাঁহাকে দেখিয়া বিষ্ণু-প্রিয়ার নয়ন পরিতৃপ্ত হইত। এক্ষণে তিনি যেন স্বামীর বৈরাগ্যব্রত গ্রহণের বলিস্বরূপ হইলেন। কি করিবেন, দাস আপনার প্রভুর আজ্ঞায় তাঁহার

বিশেষ কার্য্য সাধনে ব্রতী হইয়াছেন ইহার উপর আর কথা নাই। গৌরের দেবপ্রভাবে বিষ্ণুপ্রিয়াও মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এই জন্য সংসাররূপা সমান্যা রমণীর ন্যায় তিনি আর তাঁহাকে অভিসম্পাত করিতে পারিলেন না।

নবদ্বীপবাসিগণ দলে দলে শান্তিপুরাভিমুখে চলিল। ও দিকে ফুলিয়া গ্রামে চৈতন্যের আগমনসংবাদ শুনিয়া নানা স্থান হইতে লোক সকল তথায় গিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহাদের হরিনামকোলাহল শ্রবণে শচীকুমার গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, এবং সকলকে প্রসন্নচিত্তে আশীর্ব্বাদ করিয়া সুখী করিলেন। তদনন্তর অদ্বৈতের গৃহে আসিয়া তিনি উপস্থিত হন। ভক্তসমাগমে শান্তিপুরে প্রেমপ্লাবন হইল। অবধূত নিতাই সদলবলে উপস্থিত হইয়া গৌরের সহিত মিলিত হইলেন। বিচ্ছেদের পর সম্মিলন অতি সুখের অবস্থা, বৈষ্ণব ভক্তগণ আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসগ্রহণের পর গৌরের কিছু গাম্ভীর্য্য অধিক হইয়াছিল; নিয়মিতরূপে আহার পান করিতেন, বৈরাগ্যের শাসনাধীনে সর্ব্বদা থাকিতেন। ভক্তদিগকে দেখিবামাত্র বাহু প্রসারণপূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া পৃথক পৃথক ভাবে তিনি সকলকে আলিঙ্গন দান করিলেন; তখন প্রেমের তরঙ্গ উঠিল, নৃত্য সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল, হরিনামরসে প্রাণ মন ডুবিয়া গেল। এমন সময় শিবিকারোহণে শচীমাতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শোকে তাঁহার শরীর শীর্ণ হইয়াছে, চক্ষে নিরন্তর জল ঝরিতেছে, চৈতন্য গদ্গদ ভাবে তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। শচীর নয়নদ্বয় অশ্রুজলে এমনি পরিপূর্ণ হইল, যে তিনি সন্তানের মুখ আর দেখিতে পান না। তদনন্তর গৌরকে কোলে লইয়া স্নেহনীরে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত করিয়া দিলেন। গৌরচন্দ্র যুবা বয়সে মস্তক মুণ্ডন করিয়া দণ্ডীর বেশ ধরিয়াছেন, রক্তবসন পরিয়াছেন, জননীর প্রাণে কি তাহা সহ্য হয়! সে বেশ দর্শন করিয়া শচীর শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। তিনি নয়নজলে অন্ধপ্রায় হইয়া বারংবার পুত্রের মুখচুম্বন এবং নিরীক্ষণ করিয়া অঙ্গে হাত বুলাইতে লাগিলেন। প্রগাঢ় পুত্রবাৎসল্য এবং অকৃত্রিম মাতৃভক্তির কি চমৎকার সম্মিলনই এখানে হইল! অনন্তর শচীমাতা খেদ করিয়া বলিলেন বাপ নিমাই! বিশ্বরূপ যেমন নিষ্ঠুরতা করিয়াছে তেমন করিও না, এক একবার যেন দেখা পাই। গৌরের চক্ষু হইতে দরদরিত ধারে প্রেমাশ্রু বহিতে লাগিল। তিনি জননীকে পুনঃ পুনঃ

প্রণিপাত করিয়া প্রবোধ বাক্যে বুঝাইলেন, এবং অঙ্গীকার করিলেন, আমি কখন উদাসীন হইব না, যেখানে তুমি থাকিতে বলিবে সেইখানে আমি থাকিব। কেবল গৃহাশ্রমে যাইতে পারিব না, ব্রহ্মচারীর পক্ষে তাহা নিষেধ। সীতাদেবী শচীকে অন্তঃপুর মধ্যে লইয়া গেলে গৌরচন্দ্র ভক্তবৃন্দের সঙ্গে ভালরূপে আলাপ করিতে বসিলেন। তিনি বলিলেন, তোমরা আমার জন্য দুঃখিত হইও না, আমি চির দিন তোমাদেরই থাকিব, তবে জন্মস্থানে কুটুম্ব লইয়া থাকা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নয়, এই জন্য আমাকে দেশ পরিত্যাগ করিতে হইল। কিয়ৎকাল পরে শচীমাতার সঙ্গে সকলে এই পরামর্শ স্থির করিলেন যে, নীলাচলে প্রভু যদি থাকেন তাহা হইলে কখন বা আমরাও তথায় যাইতে পারিব, হইল কখন বা তিনিও গঙ্গাস্নান উপলক্ষে গৌড়দেশে আসিতে পারিবেন। শচী সকল মায়া মমতা ত্যাগ করিয়া বলিলেন, আমার বিশ্বম্ভর যাহাতে সুখে থাকেন আমি তাহাই করিব, তাঁহাকে লোকে নিন্দা করিবে ইহা আমার প্রাণে সহিবে না, যেখানে তিনি থাকিতে ভালবাসেন থাকুন, কেবল এক একবার আমি যেন দেখা পাই। চৈতন্য পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তাঁহারও মনে মনে এইরূপ ইচ্ছা ছিল। পরে শচীমাতা স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভক্তগণ সহ সন্তানকে ভোজন করাইলেন। ইহার পূর্ব্বে কয়েক দিন গৌরাঙ্গের প্রায় উপবাসেই গিয়াছিল। দশ দিন কাল এখানে তিনি থাকেন। নগরমধ্যে সে কয়েক দিন অতিশয় জনকোলাহল হইয়াছিল। এত লোক গৌরদর্শনে আসিয়াছিল যে তাহা গণনা করা যায় না। এক দিন অদ্বৈত আচার্য্য চৈতন্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাল তুমি জ্ঞানপথ ত্যাগ করিয়া ভক্তিশিক্ষা দিয়া থাক, তবে অদ্বৈতবাদপথের সন্ন্যাসব্রত কেন গ্রহণ করিলে? ইহাতে তিনি এই উত্তর দিলেন যে, আমি হরিবিরহে কাতর হইয়া তাঁহাকে পাইবার জন্য, এবং সংসার ছাড়িয়া নিরন্তর তাঁহার সেবার জন্যই যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক মস্তক মুণ্ডন করিয়াছি। মায়াবাদ, অদ্বৈত মত আমি কখন স্বপ্নেও কর্ণে শুনি না। দণ্ড ধারণ করিয়াছি, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, আমার মন পশুর সমান, হস্তে দণ্ড না থাকিলে সে পশুকে বশে রাখা যায় না। অদ্বৈত গোস্বামী হাসিয়া বলিলেন, ঠাকুর! তুমি আবার আমার নিকট প্রতারণা করিতেছ! যখনই চৈতন্য আপনাকে সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় নিজের দৈন্য ভাব প্রকাশ করিতেন তখনই অদ্বৈত এবং

আর আর সকলে তাঁহাকে প্রবঞ্চক প্রতারক বলিয়া হাস্য করিতেন। এই জন্য বোধ হয়, এ কথা পুনঃ পুনঃ আর তিনি বলিতেন না, বলিলে আরও বিপরীত ঘটিত। ইহা বড় কৌতুকের বিষয় যে মহাপুরুষেরা শত্রু, মিত্র, উভয়েরই নিকট প্রবঞ্চক বলিয়া পরিগৃহীত হন। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত মহাজনেরা প্রবঞ্চক কি পৃথিবীর লোকেরা প্রবঞ্চিত তাহা এ পর্য্যন্ত ঠিক হইল না। সকলই ভগবানের লীলা খেলা ছলনা চাতুরী, মানুষ কেবল সাক্ষীগোপাল।

শচীদেবী এবং ভক্তগণকে বিদায় দিয়া চৈতন্য যখন নীলাচল যাত্রা করেন তখনকার অবস্থা স্মরণ করিলে পাষাণ বিগলিত হয়। তিনি বলিলেন হে বন্ধুগণ! আমার এইমাত্র ভিক্ষা যে তোমরা ঘরে গিয়া সর্ব্বদা হরি আরাধনা এবং হরিসঙ্কীর্ত্তন করিবে, এক্ষণে আমাকে বিদায় দাও, আমি নীলাদ্রি গমন করি। শেষোক্ত প্রস্তাব শ্রবণে অদ্বৈতাদি সমস্ত ভক্তগণ বলিলেন, এ সময় উড়িষ্যার রাজার সঙ্গে মুসলমানদের যুদ্ধ হইতেছে, শ্রীক্ষেত্রের পথে অত্যন্ত দস্যুভয়, লোক জন যাতায়াত করে না, আর দিন কতক থাকিয়া বিশ্রাম কর, বিবাদ নিষ্পত্তি হইলে পরে যাত্রা করিও, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা আর কি বলিব। মহাপ্রভু বলিলেন, যতই কেন প্রতিবন্ধক থাকুক না, আমি নিশ্চয়ই যাইব। প্রতিজ্ঞা শুনিয়া আর কেহ তাঁহাকে বাধা দিতে সাহস করিলেন না। অতঃপর নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ, ব্রহ্মানন্দ, জগদানন্দ প্রভৃতি কয়েক জনকে সঙ্গে লইয়া চৈতন্যদেব নীলাচল যাত্রা করিলেন। তাঁহার বিরহে সমস্ত ভক্তগণ চীৎকার রবে কাঁদিয়া ধূলায় লুটাইতে লাগিলেন, পুত্রবিরহিণী শচীমাতা কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাইয়াও পুনর্ব্বার শোকে আকুল হইলেন। তৎকালে বৃদ্ধ হরিদাস কৃতাঞ্জলিপুটে সজল নয়নে যে কয়েকটী কথা বলেন তাহা শ্রবণে চৈতন্যের প্রাণ বড় বিদ্ধ হয়। হরিদাস কাঁদিয়া বলিলেন, প্রভো! তুমি নীলাদ্রি চলিলে আমার গতি কি হইবে? তথায় যাইবার আমার শক্তি নাই, অধম যবন আমি, কিরূপে তোমায় না দেখিয়া আমি এই পাপজীবন ধারণ করিব? দয়াবান্ গৌর প্রেমগদ্গদ স্বরে বলিলেন, হরিদাস তুমি দৈন্য সংবরণ কর; তোমার কথা শুনিয়া আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়, আমি তোমাকে পুরুষোত্তমে লইয়া যাইব, তুমি আশ্বস্ত হও। তদনন্তর জননীকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ, প্রত্যেক বৈষ্ণবকে আলিঙ্গন ও প্রেম সম্ভাষণ করিয়া চৈতন্য পুরীধামে চলিয়া গেলেন, যাত্রিগণ স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিল।